শুভ বিবাহ

শ্রীপ্রজাপতি শর্ম্মা

রত্না প্রকাশনী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

SUBHA BIBAHA

A Bengali Novel

by

Sri Prajapati Sharma

॥ এক ॥

রাত্রি যায়, দিন আসে। জোয়ারের শেষে যেমন ভাঁটা, তেমনি সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা-গড়ার খেলা চলছে অহরহ অবিরাম!

পৃথিবী পরিবর্তনশীল। অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান কালচক্রের আবর্তনে সৃষ্টি হয়েছে আজ, কাল, পরশু, স্বপ্ন-বাস্তব, সত্য-মিথ্যা।

আজ যা চিরন্তন সত্য, কাল হয়ত তা স্বপ্নের মত মনে হবে। হয়ত শুধু স্মৃতিটুকুই থাকবে কালের সাক্ষীর মত। হয়ত তাও থাকবে না, প্রকৃতির স্মৃতিপট থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনি হয়ে আসছে সৃষ্টির আদি কাল থেকে।

ঠিক তেমনি—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ঐ বিরাট রাজবাড়িটা আজ শুধু বিগত দিনের স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্যামবাজারের মোড় ছাড়িয়ে বি. টি. রোড ধরে সোজা চলে গেলে সিঁথির মোড়টার খানিকটা পরেই রাস্তার বাঁদিকে একটা পুকুর ছিল। আজ অবশ্য পুকুর নেই। ভরাট হয়ে নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে তার উপর। তারপরই একটা গলি এঁকেবেঁকে বরানগরের ভিতরের দিকে চলে গেছে। গলিটার মুখেই হেম লজের সীমানা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট প্রাসাদ। বড় রাস্তার উপর প্রকাণ্ড লোহার গেট, পাশে দুটো বড় বড় থাম।

ঐ থাম দুটোর গায়ে পিতলের ফলকে লেখা রায়বাহাদুর ইন্দ্রকুমার রায়ের নামটা আজ ধুলায় ঢাকা পড়ে গেছে। থাম দুটোর উপর বড় বড় সিংহ দুটিকে দেখলেই এ বাড়ির আভিজাত্য আর প্রতিপত্তির কথা মনে পড়ে।

গেট দিয়ে ঢুকেই রাস্তাটা দু'দিকে ভাগ হয়ে দু'দিক থেকে ঘুরে হেম লজের সামনে গিয়ে মিশেছে। রাস্তার দুদিকে নানা

রকম দেশী বিদেশী দামী দামী ফুলের গাছ। মাঝখানে ফোয়ারা, তার পাশে শ্বেত পাথরের তৈয়ী ভেনাসের বিরাট মূর্তি। ডান দিকের কোণে একটা নকল পাহাড়; সামনের দিকটা পামগাছের সারি। কোণের দিকে দু'তিন ঝাড় চীনা বাঁশ। পিছন দিকে খানিকটা চার কোণা জায়গা রঙিন পাতাবাহারের গাছে ঘেরা, তার পিছনে বাগান। আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি সব রকমের ফলের গাছ দু-একটা আছে। তারপর ঘাট-বাঁধানো পুকুর।

আজ আর সে শোভা নেই হেম লজের। একজন মাত্র বাগান মালী এতবড় বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে সপরিবারে। বর্তমান মালিক তাদের লেক প্লেসের নতুন বাড়িতে উঠে গেছে কিছুদিন আগে; আর সেই থেকে 'হেম লজ' বিরহী-বধূর ব্যথা বুকে নিয়ে নিজের মনে গুমরে মরছে। বাতাসে তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে থমকে দাঁড়ায় বি. টি. রোডের পথিক। হেম লজ এমনি করেই নিঃশব্দ কান্নায় আকর্ষণ করে পথিককে, আর জানায় তার নিজের অন্তরের অন্তরতম করুণ কাহিনী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছু না বুঝেই পথিক এগিয়ে যায় তার নিজের পথে, হেম লজ তবুও করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আকাশের পানে। ঝির-ঝির, শির-শির—একটা চাপা হাওয়া বাড়িটাকে ঘিরে ঘুরে বেড়ায় দিনরাত।

অথচ এই ত সেদিনের কথা।

হেম লজের দোতলার ঘরটিতে বসে একমনে চিন্তা করছেন রায়বাহাদুর ইন্দ্রকুমার। একাকী নিঃসঙ্গ জীবন একঘেয়ে লাগে। জীবনের বাকি দিনগুলির কথা হয়ত ভাবছিলেন, নয়ত বিগত জীবনের হিসাবের খাতার পাতাগুলি একবার স্মরণ করছিলেন। আর মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করছিলেন। একমাত্র মেয়ে মাতৃহীনা মিতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাত বাড়ছে।

এ অঞ্চলে ইন্দ্রকুমারকে চেনে না বা তাঁর কিঞ্চিতারিক্ত স্নেহ বা করুণা লাভে ধন্য হয় না, এমন কেউ নেই।

ইন্দ্র রায়ের টাকা সম্বন্ধে কত লোক কত রকম বলে। কেউ বলে কোটীপতি, কেউ বলে যক্ষের ধনে ভাণ্ডার ভর্তি রায়বাড়ি।

তবে একথা যেমন ঠিক যে বিশ পঁচিশ লাখ টাকা ইন্দ্রকুমারের নগদ জমানো আছে, তেমনি অত টাকা, ধন-দৌলত থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রকুমার সুখী হতে পারেননি।

বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু হঠাৎ দেখলেই মনে হয় সত্তর পঁচাত্তর নিশ্চয় হবে।

শৈশবে পিতৃহারা গরীব ইন্দ্রকুমার গ্রামে মায়ের স্নেহে কোন প্রকারে সুখে দুঃখে দিনযাপন করছিল, কিন্তু তাও তার অদৃষ্টে বুঝি সইলো না। মাত্র সাত বৎসর বয়সে মা কলেরায় মারা গেলেন।

নাবালক ইন্দ্রকুমার দু'চোখে অন্ধকার দেখলেন। শেষ আশ্রয়টিও গেল। গ্রামের লোকেরা হায় হায় করতে লাগলেন। ছেলেটা পথে বসল। একমাত্র ভিক্ষে ছাড়া ওর আর কোনও উপায় নেই।

নজের বলতে এই পৃথিবীতে ওর আর কেউ নেই যে ওকে অন্ততঃ দু'মুঠো ভাত দেবে দু'বেলা।

গুরুদশা তখনও কাটেনি।

এমন সময় হঠাৎ একদিন দৈবের আশীর্বাদের মত গ্রামে এলেন মহিমবাবু। ইন্দ্রর সম্পর্কে মামা হন।

ইন্দ্রের মায়ের মামাতো ভাই মহিমবাবু। কলকাতার বরানগরের ডাকসাইটে জমিদার। কোনও দিন কেউ কারও খোঁজ খবর নেননি। সম্পর্ক একরকম ছিল না বললেই হয়।

লোকের মুখে ইন্দ্রর অবস্থার কথা শুনে গ্রামে এসেছেন।

এসেই গ্রামের দু'চারজন প্রধান গ্রামীনদের ডেকে তাদের সানন্দানুমতি নিয়ে ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

সর্বহারা ইন্দ্র অকূলে ঠাঁই পেল মামার কাছে।

নিঃসন্তান মহিমবাবু ও স্ত্রী হেমলতা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। হেমলতারও পুত্রের আশা নেই, তাই ইন্দ্রকে পেয়ে

তাঁর মাতৃত্ব পূর্ণতা পেল। ইন্দ্র হল ওদের প্রাণাধিক প্রিয়, ওদের ব্যর্থ জীবনের মিলন-সেতু।

শুরু হল ইন্দ্রের নতুন জীবন।

মহিমবাবু পুত্রাধিক স্নেহে ও যত্নে ইন্দ্রকে লালন-পালন করতে লাগলেন। একের পর এক বিদায় নিল কয়েকটা বছর। যৌবনের শুরুতে ইন্দ্রকুমার পেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা স্বীকৃতি-পত্র।

ইন্দ্রকুমারকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পাঠাবার জন্ম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মহিমবাবু। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই পৃথিবীতে সব-কিছু হয় না। বাড়ি বা দেশ ছেড়ে যাওয়াতে সবচেয়ে বড় বাধা হলেন হেমলতা। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ইন্দ্রকে কাছ ছাড়া করতে রাজী হলেন না।

কিন্তু বেশীদিন তিনি ইন্দ্রকে আঁচলের তলায় আটকে রাখতে পারলেন না। দিন কুড়ি পরেই একদিন দিনের শুরুতে গুমরে কেঁদে উঠল হেম লজ। শেষ হল হেমলতার গোণা দিন। ঢলে পড়লেন তিনি চিরপ্রশান্তময়ী চিরন্তনী সুষুপ্তির অঙ্কে।

মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথা হল, ইন্দ্র যেন তার মামাকে এবং এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও একটি রাত্রিও না কাটায়। আর মহিমবাবুকে বলে গেলেন, এই বৎসরেই যেন ইন্দ্রর বিয়ে দেন। দুজনে চোখের জল মুছে মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে প্রতিজ্ঞা করল।

হেমলতার মৃত্যু ইন্দ্রর বুকে মাতৃবিয়োগের চেয়েও বেশী আঘাত করল। আর মহিমবাবু আরও বেশী আহত হলেন। দু-তিন মাসের মধ্যে তাঁর মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেল দুশ্চিন্তায়।

এ বাড়ির বদ্ধ হাওয়ায় মহিমবাবু আর থাকতে পারেন না। অগত্যা তিনি বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে।

ইন্দ্র বার-বার নিষেধ করল, এই বয়সে একলা দেশ-বিদেশে গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তায় ঘোরা ঠিক নয়। কাজ-কর্ম দেখাশোনার

ভার সবই ইন্দ্র নিজেই করছে। দিন-রাত্রি কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থেকে নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়েছে। কিন্তু মহিমবাবুর জন্যে তার চিন্তার অবধি নেই।

মহিমবাবু নিজে ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তাই খুঁজে-পেতে মেয়েও বার করলেন মনের মত।

শৈশবে মাতৃহারা খুব নামকরা ডাক্তারের একমাত্র আদুরে দুলালী। শিক্ষা-দীক্ষার ত্রুটি রাখেননি মেয়ের বাবা। বনেদী গৃহস্থঘরের এবং চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে পুরোপুরি হিন্দুয়ানী গৃহস্থালীর ছাপ।

ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন মহিমবাবু।

সেই মাসের শেষে একদিন শুভক্ষণে বিরাট অনুষ্ঠান করে বিয়ে হল ইন্দ্রর। দু'হাতে খরচ করলেন মহিমবাবু।

হেম লজ আবার খুশীতে আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল।

গৃহলক্ষ্মী হয়ে এলো নববধূ 'বিজয়া'।

নববধূকে অভ্যর্থনা জানালেন মহিমবাবু হেম লজে একলক্ষ ঘৃত প্রদীপ জ্বেলে। সে দৃশ্য যারা দেখেছিল তারা কোন মন্তব্য প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পেল না।

মহিমবাবুর আনন্দ আর ধরে না। আশি বৎসর বয়সেও যেন তিনি আবার নাবালক শিশুটি সেজেছেন।

অদ্ভুত মেয়ে বিজয়া। মাত্র ক'দিন হল এ বাড়িতে এসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে হেম লজের সকল পরিবেশের সঙ্গে।

বিজয়া যেন এ বাড়ির নতুন বৌ নয়। এ বাড়ির একমাত্র মেয়ের মতই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই খুঁটিনাটি সবকিছুর ভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। পাকা গিন্নীর মত ইতিমধ্যেই খবরদারী শুরু করেছে।

শব্দ কানে আসে। নিরুপম অন্যমনস্ক হয়ে যায়। দুপুর একটা পরিচ্ছন্ন আয়নার মত ওর সামনে ভাসে। নিরুপম যেন নিখুঁত করে আর এক নিরুপমকে দেখতে চায়। তার জোরেই নিরুপম শ্রাদ্ধের কোন রীতি মানেনি। দু'চোখ বুজোয়।

'এই, ঘুমোলি নাকি ?'

নিরুপম তাকায় আধ-ভেজানো দরজার দিকে। 'কে ? সীতু ?'

'হুঁ।' সীতা ঘরে ঢোকে। 'আমি আজ বিকেলে চলে যাচ্ছি।'

'জানি।' নিরুপম ঠেস-দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসে। স্পষ্ট করে তাকায় সীতার দিকে। 'বোস।' ছড়ানো পা গুটিয়ে নেয় নিরুপম। বিছানার ওপর বসার ইশারা করে।

'থাক, আমি এখানেই বসছি।' সীতা সামান্য দূরে একটা চেয়ার টেনে বসে। পরমুহূর্তে দুজনের কোন কথা নেই। কিছু সময় সারা ঘর থমথমে।

'আমাকে বুঝি কিছু বলবি ?'

সীতা সোজা নিরুপমের চোখে চোখ রাখে। কোন উত্তর দেয় না।

নিরুপম ঈষৎ বিস্মিত হয়। সীতাকে দেখে। 'কিরে, কি দেখছিস অমন করে ?'

'দেখছি, তুই কত বদলে গেছিস।' সীতা চাপা শ্বাস ফেলে।

'যেমন।' নিরুপমের চোখে কৌতূহল স্পষ্ট হয়।

সীতা মুখ টিপে হাসে। 'আগে যদিও বা কিছু কথা বলতিস, আজকাল তা-ও বন্ধ হয়ে গেছে। দিদির কাছেও আসিস না। কেমন যেন বুড়োটে হয়ে গেছিস।'

নিরুপম মন দিয়ে সীতার কথাগুলো শোনে। মুখে চোখে একটা বিষণ্ণ ছায়া অস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। সীতার প্রান্ত দৃষ্টি স্থির, অপলক। কোন উত্তর দেয় না। কেবল সীতার কাছ থেকে আরও কিছু শোনার জন্যে মুখের ভাবে এক উদাসীন প্রতীক্ষা থেকে যায়।

সীতার সঙ্গে নিরুপমের দৃষ্টি বিনিময় হয় এক পলক। সীতা আরও এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে নিরুপমের চোখে চোখ রেখে। ঠোটের হাসি সারা মুখে ছড়ায়। 'কিরে, বোবা হয়ে গেলি যে।'

নিরুপম এবার অস্বস্তি বোধ করে। সীতার মুখের ওপর বেশীক্ষণ দৃষ্টি রাখতে আড়ষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। সীতার বয়স কতই বা নিরুপমের থেকে বছর দুয়েকের বড়। একটি ছেলের মা। সুখী, সচ্ছল। বিয়ের আগে স্বাস্থ্য যেরকম রেখেছিল, বিয়ের পর একটু মুটিয়ে যেতে যেতে মানানসই অবস্থায় থেমে যায়। সীতা এখন এ বাড়ির মেয়ে নয়। এই বাড়িতে ওকে দিনরাত কাটাতে হয় না। এ বাড়ির কোন ভাবনাই ওর নেই। এ বাড়ি সম্বন্ধে মানসিক কোন নীতিবোধ, পাপ-পুণ্যের ভাবনায় ও আজ তাড়িত হয় না। বাবার স্নেহচ্ছায়ায় কাটাবার সময়ও এসবের কোন ভাবনার দায়িত্ব সীতা এক মুহূর্তও বয়ে

বেড়ায়নি। মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকে। নিরুপম এতে ভয় পায়। নিজেকে কেন ও এমন হাসিখুশী রাখতে পারে না? সীতার মত সব কিছু মানিয়ে চলার ক্ষমতা কি নিরুপমের নেই?

নিরুপম কিছু বলতে যায়, সীতার দিকে তাকায়।

সীতা বলে, 'আমি কিছু কিছু বুঝতে পারি।' সীতার অপলক চোখে তীব্র অনুসন্ধিৎসা স্পষ্ট হয়।

'কে, মা কিছু বলেছে নাকি?' নিরুপম হাসতে চেষ্টা করে।

সীতার স্বর এসময় ঈষৎ ভারী শোনায়। বলে, 'মা কেন বলতে যাবে? যার চোখ আছে সেই বুঝতে পারে।' নীরব থাকে কয়েক মুহূর্ত। যেন আরও কিছু বলার জন্য প্রস্তুত।

'আমি কোন ভুলই করিনি।' নিরুপমের স্বর কঠিন, গম্ভীর।

সীতা সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'বাবার মৃত্যুর সময় তুই যা করেছিস। এমন কি শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজের মধ্যেও।' সীতার কণ্ঠে কাতরতা লেগে থাকে। একটু সময় থেমে কি ভাবে। চাপা গলায় বলে, 'আমি ভাবতেই পারি না রে নিরু, কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলে এরকম করতে পারে।'

নিরুপম এতক্ষণে সীতার চাপা অভিযোগ, অভিমান স্পর্শ করে। দিদি হিসেবে একটা চাপা শাসনও বুঝি কথাগুলোর মধ্যে থাকে। বলে, 'তুই তো জানিস আমি কারো মৃত্যুর সামনে দাঁড়াতে পারি না।'

'তা বলে বাবার কাছে যাবি না! তোকে দেখে কেমন নির্বিকার মনে হয়েছিল।' ঈষৎ ভুরু কুঁচকায় সীতা।

নিরুপম সীতার বিরক্তি লক্ষ্য করে। একসময়ে নিরুপমের ঠোঁটে হাসির আভাস খেলে যায়। 'মনে হচ্ছে, তুই ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিস?'

'আমি ক্ষুব্ধ হলে তোর কি?' সীতা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। 'ছোট মা খুব আঘাত পেয়েছেন। বাবা মারা যাবার থেকেও বুঝি অনেক বেশী।' সীতার কথার সঙ্গে সঙ্গে মুখের রেখাগুলোয় চাপা যন্ত্রণা ভেসে ওঠে।

'তার মানেই মা বুঝিয়েছে তোকে, এই তো? মা-ই বুঝি পাঠালো তোকে?' নিরুপম এবার জোর দিয়ে কথা বলে। একটা সিগারেট ধরায়। পর পর কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে সীতার দিকে অনায়াসে তাকায়।

সীতা খোলা জানালা দিয়ে একভাবে বাইরে দৃষ্টি রাখে। 'একটা কি ব্যাপার জানিস নিরু।' সীতা হঠাৎ থামে। নাসারন্ধ্র মুহূর্তে একটু স্ফীত হয়ে স্বাভাবিক হয়ে যায়। চাপা কোন আবেগ, তীব্রতর কোন অনুভূতির প্রকাশ বন্ধ করার জন্য সীতা নীচের ঠোঁট দংশন করে। নিশ্বাসে বুক ওঠে-নামে। সীতা বলতে পারে না। দু'চোখ চকচক করে ওঠে।

ঢং ঢং ঢং···

ন'টা বাজল। ভিতরের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ইন্দ্রর সহ্যের ও ধৈর্যের সীমা আর বুঝি থাকে না। কেবলই মনে হচ্ছে যেন এক ধাক্কা মেরে ভিতরে চলে যায়, যেখানে বিজয়া রয়েছে। আর দাঁড়াতে পারে না ইন্দ্র। ধপ করে বসে পড়ে সোফাটার উপর।

এমন সময় খুট্ করে শব্দ হতেই চমকে উঠল ইন্দ্র। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেন ডাঃ মিসেস বসু।

অবিন্যস্ত চল। চোখে অপরাধীর দৃষ্টি।

ইন্দ্র ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে মিসেস বসুকে। মাথা নীচু করে জবাব দেন ডাক্তার।

এ ফিমেল বেবী বর্ণ য়্যাণ্ড সেভড্ বাট পেসেন্ট······। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে ডাঃ মিসেস বসুর। চিৎকার করে ওঠে ইন্দ্র।

—বাট, হোয়াট ডক্টর? প্লিজ—তাড়াতাড়ি বলুন।

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে ধরা গলায় বলেন ডাঃ মিসেস বসু।

—ডোণ্ট বি নার্ভাস মিঃ রয়। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, এতটুকু ত্রুটি হয়নি। কিন্তু পারলাম না তবু মিসেস রয়কে রক্ষা করতে। দিস ইজ ফার্ষ্ট ইন মাই লাইফ। মিসেস রয় হার্টফেল করেছেন, য়্যাণ্ড ইট ওয়াজ কোয়ায়েট আন-এক্সপেক্টেড।

মিসেস বসুর কথা শুনবার আর সময় নেই ইন্দ্রর। দরজায় ধাক্কা মেরে ছুটে যায় ঘরের মধ্যে বিজয়ার কাছে। কই, কি হয়েছে বিজয়ার? এই ত আমার বিজয়া। যেন ঘুমিয়ে আছে। চোখে-মুখে প্রশান্তির ছাপ। দেখলে মনে হয় দীর্ঘ পরিশ্রমের পর সাফল্য লাভ দেখে ক্লান্তিতে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি কপালে মুখে বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে ইন্দ্র, যদি কোথাও জীবনের উষ্ণতার আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু হায়! মৃত্যুর হিমশীতল হাত অনেক আগেই তাকে স্পর্শ করেছে।

ভেঙে পড়ে ইন্দ্র। বিজয়ার বুকের উপর মাথা রেখে শিশুর মত কেঁদে ওঠে।

মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ যায় নানাস্থানে। বিজয়ার বাবা, মহিমবাবু, ইন্দ্রর বাল্যসাথী বিলাস দত্ত সকলে এসে দাঁড়িয়েছেন বিজয়ার পাশে।

নির্বাক নিস্পন্দ সকলে।

এখনও কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না বিজয়া নেই।

ইন্দ্র তেমনি দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ার মুখের উপর ঝুঁকে। তার অপলক দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ হয়ে আছে বিজয়ার বন্ধ চোখের উপর। আর তার মনের মৌন আবেগ জলের ধারা হয়ে ঝরে পড়েছে ফোঁটা-ফোঁটা টপ-টপ করে বিজয়ার চোখের পাতার উপর, মুখের উপর। যেন বিজয়ার চোখের জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে তার মুখের দু'পাশ দিয়ে। নিভে যাওয়া চিতার উপর যেন প্রকৃতির শান্তিবারি ঝরে পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা। সকলের চোখে জল, কণ্ঠে রুদ্ধ কান্না। এই হল জন্ম-জন্মান্তরের শাশ্বত জিজিয়া কর। কান্নাই সৃষ্টির প্রথম ও শেষ রাগিণী, স্রষ্টার সৃষ্টির আদি রহস্য।

॥ তিন ॥

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সৃষ্টির নিয়ম বোধহয় তাই। তার কল্পনাসৌধ যখন চোখের সামনে বিনামেঘে বজ্রাঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, একমাত্র আশার উপর যখন তুষারপাত হয়, সে তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই সুন্দর পৃথিবী, এই সংসার সব কিছু তার কাছে মূল্যহীন হয়ে যায়।

দীর্ঘ কুড়ি বছর পর মিতা ফিরে এসেছে ইন্দ্রর কাছে।

কিন্তু দুদিনেই যেন মিতা হাঁপিয়ে উঠেছে। কলকাতার শিক্ষা

শেষ করে দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর কলকাতা ছেড়ে গেছে। এখানে এসে এখন কোনও পরিচিতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে না পেরে মনটা কেমন করছিল।

তার পরদিন বেরিয়ে পড়ল বেড়াতে। সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে ফিরল রাত্রে।

সোসাইটীর আর সকলে পাঁচ বৎসর বাদে মিতাকে পেল এক নতুন মানুষরূপে। উচ্ছল-যৌবনা মিতার দিকে তাকানো যায় না। চোখ ঝল্‌সে যায় যেন। স্বভাবসুন্দরী লাবণ্যময়ীর লাবণ্য-কুসুম পূর্ণ বিকশিত। সে রূপের দিকে যে একবার তাকায় সে আর চোখ ফেরাতে পারে না।

এমনি অবস্থায় স্বভাবতঃই ভ্রমরের দল এল গুনগুনিয়ে, ভীড় করে তারা চারপাশে। তাদের গুঞ্জনধ্বনিতে কুসুম নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সময় পায় না ভালো-মন্দ বিচার করবার।

এবার সোসাইটীতে এসে মিতা নিজেকে নতুন মানুষ বলে আবিষ্কার করল। সোসাইটীর একমাত্র লক্ষ্যবস্তু মিতা। একমাত্র আলোচনার বিষয় মিতার রূপ-গুণের নানা কাহিনী।

কেউ কেউ মনে মনে হিংসা করত।

হিংসা করবারই কথা।

রূপ, গুণ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ধন-ঐশ্বর্য সবকিছুই ছিল তার প্রচুর। সাধারণের নজরে পড়ার মত।

কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। বরং প্রশস্তি করত সকলে। আর এন্‌গেজমেন্ট বাড়তে থাকে একের পর এক।

ফলে বাড়ির কথা প্রায়ই মনে থাকতো না অথবা মনে করবার মত অবসর পেত না।

একটি একটি করে দিন কাটতে থাকে।

কয়েকদিন থেকে ইন্দ্রও লক্ষ্য করছিল মিতার এই অবস্থা। কখনও মনে হয় ওকে ডেকে একবার বারণ করে দেয়, কিন্তু তাতে

হয়ত মিতা মনে কষ্ট পেতে পারে। ওর মনে কষ্ট দেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না ইন্দ্র।

প্রথম প্রথম ইন্দ্র না খেয়ে অপেক্ষা করত মিতার জন্যে। কিন্তু মিতা হয়ত এগারোটায় ফিরে এসে খবর পাঠালো, সে খাবে না, খেয়ে এসেছে। তারপর থেকে ইন্দ্রকে আগেই খাবার দিয়ে যেত চাঁপা। ও রোজই রাত্রে খেয়ে আসে, আপনি শুধু শুধু ওর জন্যে বসে না থেকে খেয়ে নিন, বলতো চাঁপা।

কিন্তু ইন্দ্রর অসহ্য হয়ে উঠল ক্রমশঃ। একেবারে চুপ থাকাও যায় না। তাই চাঁপার কথার উত্তরে বললো।

—তাই বলে ও যা খুশী তাই করবে নাকি?

—ও ছেলেমানুষ, আমি বুঝিয়ে দেব'খন। তার জন্যে আপনি মন খারাপ করবেন না। তাছাড়া আর ক'দিনই বা ছেলেমানুষী করবে? আজ বাদে কাল বিয়ে হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বেশ, দেখ, যা ভালো বোঝ তাই করো।

চাঁপা ক'দিন ভাবছে মিতাকে একটু সাবধান করে দেবে, কিন্তু মিতার সামনে গিয়ে বলতে যেন সাহস হয় না।

বাড়িতে আসার পর থেকে মিতার মেজাজ সদা-সর্বদা কেমন যেন হয়ে থাকে। পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষে নেই। এ নিয়ে অন্যান্য চাকর-বাকরেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করে মাঝে-মাঝে। এমন কি, চাঁপার কাছেও অনুযোগ করেছে। চাঁপা অবশ্য তাদের অন্য রকম বুঝিয়ে তখনকার মত নিরস্ত করেছে; কিন্তু সে নিজেও সশঙ্কিত হয়ে থাকত সর্বদা। তার কেবলই ভয় হত, এই এতগুলো চাকর-বাকরের সামনে যদি অন্যের মত তাকে অপমান করে, তাহলে?

তাহলে আর সে এখানে মুখ দেখাতে পারবে না। এমন কি, তাকে এখান থেকে হয়ত চলে যেতে হবে।

কিন্তু এ বয়সে সে যাবেই বা কোথায়?

প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর তার গায়ের রক্ত জল করেছে সে এই বাড়ির কল্যাণে।

আজ বিজয়া বেঁচে থাকলে এসব কথা তাকে ভাবতে হত না।

কিন্তু ইন্দ্র আবার কখন হয়ত জিজ্ঞাসা করে বসবে যে তুমি মিতাকে বলেছিলে কি না।

চাঁপা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ইন্দ্র চাঁপাকে বলল।

—মিতাকে ডেকে আমি নিজে সব কথা বলেছি। বিয়ের কথাও ওকে শুনিয়ে দিয়েছি। কিন্তু চাঁপা, আমি ভাবতেও পারি না যে, বিজয়ার গর্ভের সন্তান এই রকম হবে। আমারই সামনে আমার ইচ্ছার প্রতিবাদ করবার স্পর্ধা রাখে! খাবারের ঢাকা খুলে দিতে-দিতে চাঁপা বললো,—ওর আর দোষ কি? যেমন শিক্ষা পেয়েছে তেমনি হয়েছে। সোনার গায়ে কালো রং লাগিয়ে দিলে সে আর সোনা থাকে না।

—হ্যাঁ, এবং সেজন্য আমিই দায়ী। অবহেলা করে আমিই ওর সর্বনাশ করেছি, তার জন্যে আমাকেই ভুগতে হবে। তাই আমি তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করে ফেলব ঠিক করেছি।

—সেই ভালো হবে। বিয়ের জল গায়ে পড়লে ওসব ছেলেমানুষী সেরে যাবে।

—তা পাত্র ঠিক করলেন কিছু?

—অন্য পাত্রের সন্ধান এখনও পাইনি। আমি আজই বিলাসকে আসতে বলেছি। ও এলে ওর ছেলের সঙ্গে কথাটা পাকা করে ফেলব ভাবছি। এমনিতে ত ওরা আজ তিন বছর ধরে তাগাদা দিচ্ছে। আমিই বরং সময় নিয়েছিলাম যে, মেয়েটা শিক্ষা শেষ করে ঘরে আসুক, তারপর বিয়ে দেব। আজ বিজয়া থাকলে মামাকে এসব সহ্য করতে হত না। আমি ভাবতেও পারি না যে, এখনও একটা বছর শেষ হল না, এরই মধ্যে ও এতটা বাড়াবাড়ি করবে। যাই হোক, তুমি কিছু ভেব না। এই মাসের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা আমি করছি।

সেদিন মিতার আর কোথাও বেরুনো হল না। সারাদিন ঐ এক চিন্তা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কখনও বা ঘরময় পায়চারী করে বেড়ায়, আবার কখনও বা বিছানায় বসে চিন্তা করে।

ভাবে আর ক্রমশঃ অস্থির হয়ে ওঠে। একটা বিপদের আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠে।

এখানে থাকলে তাকে বিয়ে করতেই হবে। আর তার ভয়াবহ পরিণাম সে স্বচক্ষে দেখেছে। যেমন ভুগছে মিসেস দত্তগুপ্ত, মিসেস ঘোষাল, মিসেস চৌধুরী। তাকেও তেমনি করে আইনের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হবে। অতএব এখান থেকে কোনও মতে পালাতেই হবে, এদের ধরা-ছোঁওয়া থেকে অনেক দূরে।

কোনও পুরুষ তার উপর কর্তৃত্ব করবে, এ একেবারে কল্পনাও করা যায় না। তার জীবনে পুরুষ হল একটা খেলার সামগ্রী। মিসেস ব্রাউনের, মিসেস বোসের দেওয়া বীজমন্ত্র। ইতিমধ্যে পুরুষের সঙ্গ পেয়েছে—ভোগও করেছে।

কিন্তু সে হল তার ইচ্ছেমত খেয়ালমত পরিচ্ছদ বদলাবার মত।

তার স্বামী হবার উপযুক্ত পুরুষ এখনও তার চোখে পড়েনি। হয়তো নেই। বাবার উপর রাগও হয়, অভিমানও হয়। এখনই বিয়ের কী এমন দরকার হয়ে পড়ল ?

এই ত জীবন সুরু হল। তাকে যদি পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতেই না পারল তবে এ জীবনের মূল্য কি রইল ? শুরুতেই সে আটকে ফেলতে চায় না জীবনটাকে বিবাহের গণ্ডীর মধ্যে।

ভাবতে ভাবতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বার-বার মনে পড়ে ইন্দ্রর প্রস্তুতির আদেশ। বুকটা কেঁপে ওঠে যেন একটা অজানা আশঙ্কায়।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে ক্রমশঃ, দিনের সূর্য বিদায় নেয়। ঘর অন্ধকার হয়েছে অনেকক্ষণ, তবুও মিতার আলো জ্বালাবার তাড়া নেই। আজ আর আলো ভালো লাগে না। অন্ধকারে নিরালা ঘরটি তবু যেন খানিকটা সান্ত্বনা।

চাঁপা একবার এসে জিজ্ঞাসা করে গেল মিতার শরীর খারাপ করেছে কি না। নীচু স্বরে ছোট্ট একটি 'না' বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে মিতা। চাঁপার সামনে কথা বলতে বা মুখ দেখাতে কিসের যেন দ্বিধা। চাঁপা আর দ্বিরুক্তি না করে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে চলে গেল।

মিতা যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়েই রইল। আজ কোথাও যাওয়া হল না। সমস্ত এনগেজমেণ্ট বাতিল হয়ে গেল।

নিশ্চয় সকলে খুব ভাবছে তার জন্য। হয়ত এখনও প্রতীক্ষা করছে।

এমনি করে বেশ কাটছিল মিতার দিনগুলি। এমন সময় ইন্দ্রজিৎ সবকিছু ভেঙেচুরে গোলমাল করে দিলেন। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বিবাহের প্রস্তাবে এলোমেলো হয়ে যায় তার সাধের সৌধ। সামনে সমস্ত ভবিষ্যৎটা যেন অন্ধকার মনে হয় তার। ওর কল্পনারও বাইরে, কোন পুরুষ তারই খেয়ে-পরে তার উপর পতিত্বের অধিকার দাবি করবে, আদায়ও করবে। শাসন করবে, আবার শোষণও করবে তার খেয়ালখুশীমত। ওকে শুধু চোখ বুজে সব সইতে হবে। সহ্য করতে হবে তার প্রতীক—তার সন্তানকে। না, এসব আর ভাবা যায় না। এত বড় বন্ধন অসহ্য, অসম্ভব। কিন্তু—কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা কি?

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর চাঁপাকে সামনে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় মিতা। বাইরের সোফায় চুপ করে বসে আছে চাঁপা। বাইরে তখন রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। অনেক বেলা হয়ে গেছে আজ উঠতে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ন'টা। স্লিপিং গাউনটার খুঁট ধরে বারান্দায় এসে জিজ্ঞাসা করে: কিছু বলবে? চাঁপা উঠে দাঁড়িয়ে বললো,—কত্তাবাবু মনে করলেন, তুমি বুঝি উঠেছো। আচ্ছা, তুমি চান করে নাও, আমি পরে আসবো।

—না না, তুমি বলো। আমার আজ সত্যিই বড্ড বেলা হয়ে গেছে।

—শরীর খারাপ করেনি ত? মায়ের দৃষ্টিতে তাকায় চাঁপা। মিতার সর্বাঙ্গে তার তীক্ষ্ণ স্নেহভরা চাহনি বুলিয়ে নিয়ে আসে।
—এই ত মুখটা শুকনো লাগছে।

-না না, শরীর খারাপ করেনি। তুমি বলো, বাবা কি বলেছেন।

—কাল রাত্রি থেকে কত্তাবাবুর শরীরটা খারাপ লাগছে। আমাকে সকালে ডেকে বললেন: চাঁপা, কি জানি কখন দমটা বন্ধ হয়ে যায়। মরবার আগে আমি আমার একমাত্র আশা পূরণ করে না যেতে পারলে মরেও যে শান্তি পাবো না। ও শুধু একবার হাসি-মুখে 'হ্যাঁ' বলে দিক, তাহলে আমি আজই বিলাসের সঙ্গে কথাটা পাকা করে ফেলি।

চাঁপার কথা শ্রুতিকটু লাগে মিতার কানে। একে কাল রাত্রে ঘুমটা ভালো হয়নি নানা দুশ্চিন্তায়। তার উপর আজ সকালে চোখ খুলতেই আবার সেই ঝামেলা। মুড্‌টা খারাপ করে দিল একেবারে। শরীর থাকলেই তার অসুখ-বিসুখ, ভালো-মন্দ আছেই। তাই বলে আজই বিয়ের ব্যবস্থা পাকা না করলে তিনি মারা যাবেন, এ কেমন যুক্তি? ওর চোখের সামনে মুহূর্তে যেন ওর ভবিষ্যৎটা সিনেমার ছবির মত স্পষ্ট ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়। এ দাবি অযৌক্তিক—আধিপত্যের দাবি। আশৈশব স্বাধীনচেতা, ঐশ্বর্য-মদ-গর্বিতা মন তার বিদ্রোহ করে ওঠে। পারবে না সে কোন পুরুষকে স্বামী বলে স্বীকার করতে। পারবে না তাকে নিয়ে সারা জীবন টেনে নিয়ে বেড়াতে। টগবগ করে ফুটে ওঠে ওর শরীরের অসহিষ্ণু উদ্ধত রক্ত। কঠিন হয়ে ওঠে সমস্ত শিরা-উপশিরা। রক্তবর্ণ ধারণ করে দুধে-গোলাপী মুখমণ্ডল। ঝিলিক দিয়ে ওঠে বাদামী চোখের ফিকে আকাশ।

—অসম্ভব। এখন বিয়েতে মত দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এখনও ঢের সময় আছে। আমি এমন-কিছু বুড়িয়ে যাইনি। সময় হলে আমি তোমাদের জানিয়ে দেব। এর পর যদি আমার কাছে

দ্বিতীয়বার এই সব বাজে কথা বলতে আসো, তাহলে তার ফল উল্টো হবে জেনে রেখ। আমি নেহাত নাবালিকা নই।

সব কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ গম্ভীর হলেন। তাহলে ওকে আর বিরক্ত করে লাভ নেই। তুমি কি বল? নত-মস্তকে দাঁড়িয়ে চাঁপা জবাব দেয়।

—আমারও তাই মনে হয়। বড্ড জিদ। জিদ যখন ধরেছে তখন অন্তত: কিছুদিন চুপ করে থাকাই ভালো বোধ হয়।

—আচ্ছা, তুমি যাও। চাঁপা এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে দুধের গ্লাসের ঢাকনাটা তুলে ইন্দ্রজিতের সামনের টিপয়টার উপর রেখে চলে যায়। ইন্দ্রজিৎ হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নেয়:

—হ্যালো ‥ কে, বিলাস নাকি? ‥হ্যাঁ, আমি ইন্দ্র বলছি। না ভাই,…কাল রাত থেকে শরীরটা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে….হ্যাঁ, ডাক্তার রাতেও এসেছিল, আবার এই কিছুক্ষণ আগে প্রেসারটা দেখে গেল। বলল, প্রেসার খুব বেড়েছে….আরে, না না, ডাক্তাররা —আমি ভাবতে পারিনি চাঁপা, বিজয়ার সন্তান আমার মৃত্যুর কারণ হবে। হয়তো আরও দু-চার দিন বাঁচতাম। ওকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারলে মরেও দুঃখ ছিল না। যাক, বিলাসকে আসতে বলেছি, একটা উইল করে যাব ঠিক করেছি। মামাবাবুর এত বড় সম্পত্তি আমি ফুর্তি করে উড়িয়ে দিতে দেব না। তার চেয়ে বরং কোনও আশ্রমে দান করে দেব সবকিছু, নয়ত দেবোত্তর করে রেখে যাব। যার ব্যথা ভুলতে গিয়ে, যার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তুমি তোমার সবকিছু বিসর্জন দিয়েছ, আজ আমার অবর্তমানে তারই সন্তান যখন তোমার চোখের সামনে একটা একটা করে সম্পত্তি বিক্রি করে ফুর্তি করবে, আর মামীমার ঐ ঠাকুরঘরে সাহেব-মেম এসে বলড্যান্স করবে, তখন পারবে তুমি সে-সব সহ্য করতে? প্রতিবাদ করতে গেলে গলাধাক্কা দিয়ে তোমাকে রাস্তায় বের করে দেবে।

—না না, অতখানি করবে না ও। ছেলেমানুষ, এমনই একটু আদুরে। বয়স হলে আস্তে-আস্তে সব বুঝতে শিখবে। মনকে সান্ত্বনা দিতে গেলেও চাঁপার বুকটা যেন একবার ধ্বক্ করে কেঁপে ওঠে।

ইন্দ্রজিৎ ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। চোখ দুটো তাঁর রক্তবর্ণ ধারণ করে।

—না না না। বেড়ে ওঠার আগেই আমি ওকে শায়েস্তা করে যাব। আমি আজ কারো কথা শুনব না। তুমি মেয়েছেলে, মায়ের মন তোমার, বিজয়ার সহচরী তুমি। অতখানি বুঝতে পারবে না। আমাকে চোখ বুজতে দাও। তারপর ভূতের নাচ দেখে এখান থেকে যেয়ো। আর যদি ভালো চাও তাহলে পালাও তুমি। কাশীর বাড়িটা তোমার নামে দিয়ে যাচ্ছি। শ'খানেক টাকা ভাড়া ওঠে। তাতেই আশা করি তোমার একটা পেট চলে যাবে। সারাজীবন আমাদের জন্য গায়ের রক্ত জল করেছো, বাকি জীবনটা ৺বাবার স্থানে পড়ে থাকো গে। যাও, এখন আর আমার সামনে থেকো না। দেখ বিলাস এলো কি না। আমার ভালো লাগছে না।

চোখ খুলে চাঁপার দিকে তাকিয়ে দেখলেন ইন্দ্রজিৎ। চাঁপার চোখে জল। চাঁপা বুঝতে পেরেছে, কত্তাবাবুকে আর ধরে রাখা যাবে না। বিজয়ার গর্ভের সন্তানই তাঁর মৃত্যুর কারণ। একথা ভাবতেও বুকটা টন-টন করে ওঠে।

ইন্দ্রজিতের মনের গোপন ব্যথা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। আর ওকে শাসন করা যাবে না। আর কখনও শাসনের প্রয়োজন হবে না। একমাত্র নীরবে অশ্রুবিসর্জন ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

বিছানার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন ইন্দ্রজিৎ। হাত দুটো বুকের উপর আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে আটকানো। চোখ প্রায়ই বন্ধ থাকে। মাঝে-মাঝে যেন ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তখনই সে অব্যক্ত

যন্ত্রণাকে চাপা দিতে গিয়ে ওর চোখ-মুখ কুঁচকে যায়। শক্ত হয়ে ওঠে শরীরের শিরাগুলি। তখন হয়তো একবার চোখ খুলে তাকান সামনের দেয়ালে টাঙানো বিজয়ার ছবিটার দিকে, আর একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পরে, প্রায় সোয়'-তিনটে নাগাদ এটর্নি বিলাস দত্ত আর রেজিষ্টারার মিঃ চক্রবর্তী প্রবেশ করলেন। চাকাওয়ালা দু'খানা সোফা পাশাপাশি টেনে দিতে ওঁরা বসলেন। বিলাস এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্রর বুকের উপর রাখা বাঁ-হাতটার উপর হাত রেখে বললেন,

—ইন্দ্র! আমি বিলাস।

ধীরে ধীরে চোখের পাতা একটু ফাঁক হয় ইন্দ্রর। বিলাসের হাতের স্পর্শ পেয়ে ওর হাতটা ধরে নীচু স্বরে বলেন,—একটা উইল লিখে ফেল, খুব তাড়াতাড়ি। আমার সময় বেশী নেই। রেডি হও, আমি বলছি।

বিলাস দত্ত ডাঃ মিত্রের কাছে এসে ইন্দ্রর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে ডাঃ মিত্র বললেন,—কিছুই বলা যায় না। এখন ত ভালই আছেন। হয়ত দশ মিনিটের মধ্যে অবস্থা খারাপ হতে পারে। নয়ত ঠিক এমনি অবস্থায় দু'মাসও থাকতে পারে। তবে হার্টের যা অবস্থা, একটার বেশী স্ট্রোক সহ্য করতে পারবেন না। আজ বোধ হয় কোন কারণে খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন।

মিঃ চক্রবর্তী খাতাপত্র রেডি করে বিলাস দত্তকে ইশারা করতে বিলাস দত্ত ইন্দ্রর কাছে সোফাটা টেনে নিয়ে বসলেন। ইন্দ্র শব্দ পেয়ে চোখ মেলে একবার দেখে আবার চোখ বুজলেন।

—লেখ বিলাস। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং আমার নিজের উপার্জিত আমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, কোম্পানীর কাগজ, নগদ ও সোনারূপা প্রভৃতি যার একমাত্র মালিক আমি, আমার মৃত্যুর পর আমার একমাত্র কন্যা এবং উত্তরাধিকারিণী যদি তার পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার দিন পর্যন্ত প্রকৃত সনাতন হিন্দুমতে

বিবাহ করে সংসারী হয় তাহলে সবকিছুর মালিক সে অর্থাৎ আমার কন্যা হবে, এবং সে যথেচ্ছ ভোগদখলের অধিকারিণী হবে। যদি সে সম্পূর্ণ পবিত্র হিন্দুমতে বিবাহ না করে, তাহলে তার পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার পরদিন থেকে আমার সকল সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিতা হবে। তারপর থেকে এই সকল সম্পত্তি আমার মামীমার বিগ্রহ রাধারানীর নামে 'দেবত্র' বলে পরিগণিত হবে এবং তাব সেবার সকল ভার গ্রহণ করবেন এটর্নি বিলাসমোহন দত্ত। রোজগারের অংশ থেকে বিলাসমোহন দত্ত তাঁর খরচপত্র সকল গ্রহণ করবেন। আরও প্রকাশ থাকে যে, উক্ত অর্থ থেকে অর্থাভাবে লেখাপড়া শিখতে পারছে না এমন দরিদ্র মেধাবী ছাত্র এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে যতদূব সম্ভব সাহায্য করবেন। আমার মৃত্যুর পর পুরোনো যে-কোন চাকর কাজ ছেড়ে যাবে বা ছাড়িয়ে দেওয়া হবে তার হাতে নগদ এক হাজার টাকা দিয়ে দিতে হবে। কাশীর বাড়িটা যাবজ্জীবন ভোগদখল বা দান-বিক্রয়ের অধিকাব থাকবে চাঁপাবানীর। সরকার মশাই পাবেন নগদ পাঁচ হাজার টাকা। তবে যে-কোন অবস্থায় 'হেম ভিলা' দান-বিক্রয় করবার ক্ষমতা থাকবে না কারুবই। এ বাড়ির পুরোনো নিয়মানুযায়ী প্রতি বৎসর রাধারানীর রাসযাত্রা উৎসব পালন করা হবে এবং সেই সময় একশত দবিদ্র-নারায়ণ সেবা করাতে হবে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে। ষোলজন ব্রাহ্মণকে দানসাজ-সহ একখানি করে গীতা দান করতে হবে। আমাব কন্যার বিবাহের পর কোনও কারণে যদি স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা না হয় তাহলে তার স্বামী যাবজ্জীবন সকল প্রকার খরচপত্র পাবে।

ইন্দ্রজিৎ দম নিলেন।

বুকের ওঠা-নামাটা বেড়েছে আগের চেয়ে বেশী। তিনি হাঁফাচ্ছেন।

ডাঃ সেন দু'জন নার্স সঙ্গে করে এসে পড়লেন। ডাঃ মিত্র, ডা সেনকে

নিয়ে আর-একবার পরীক্ষা করেন ইন্দ্রকে। ডাঃ সেন প্রেসারটা দেখে চিন্তিত মুখে বসলেন। ডাঃ মিত্র আবার সিরিঞ্জ রেডি করেন।

বিলাস দত্ত উইলের উপর একবার চোখ বুলিয়ে ইন্দ্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলেন,—উইলের সাবজেক্টটা আর একবার ভেবে দেখবে ইন্দ্র?

—না না, দাও আমি সই করে দিচ্ছি। বিলাস দত্ত উঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রর হাতে কাগজ আর একটা কলম দিলেন। ধীরে ধীরে কাৎ হয়ে উইলের নীচে দুটো সই করলেন ইন্দ্রজিৎ। তারপর বিলাস দত্ত, মিঃ চক্রবর্তী, ডাঃ সেন ও ডাঃ রায় সকলে সাক্ষীর জায়গায় সই করতে মিঃ চক্রবর্তী রেজিষ্ট্রার বই খুলে সব উইলটা নকল করে নিয়ে চাঁপার হাতে দিয়ে বললেন,

—এটা সিন্দুকে সাবধানে রেখো। বিলাস কই, আমার কাছে এসো ভাই।

বিলাস ইন্দ্রর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—বিলাস! আমরা দু'জন বাল্যবন্ধু, ভুল করে কখনও যদি কোনও অন্যায় করে থাকি ত ক্ষমা ক'রো। বৌদির কাছে প্রতিজ্ঞা ছিল, মিতা ফিরে এলে কিরণের হাতে তুলে দেব, কিন্তু পারলাম না। তাঁকে ব'লো যেন আমার অপরাধ না নেন। আর শেষবার তোমাকে অনুরোধ করে যাচ্ছি, সবই ত জানো তুমি, তবুও যতটা সম্ভব একটু খোঁজখবর নিও।

বিলাস দত্তর কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে।

—তুমি চিন্তা ক'রো না ইন্দ্র। তুমি আবার ভাল হয়ে ওঠো তারপর দেখা যাবে। আমি ত রয়েছি। মিতা-মা তোমার তেমন মেয়ে নয়। কী-ই বা বয়স হয়েছে, এই ত সেদিন পৃথিবীকে দেখল। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

*　　*　　*

ইন্দ্রজিৎ রায় আজ ইহজগতে নেই। বোধ হয় তাঁর আত্মা তাঁর বিজয়ার দেখা পেয়েছে। হয়ত আবার তাঁরা শান্তির নীড় রচনা করেছেন কোনও অজানা দেশের নিরালা ঘরে।

কিন্তু হেম লজের চতুঃসীমার মধ্যে এখানকার প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে তাঁরা বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

মিতা এখন আবার একা।

আপনার বলতে এ পৃথিবীতে তার আর কেউ রইল না। অবশ্য আশৈশব কখনও আপনার মনের প্রয়োজন বোধ করেনি বা তেমন পরিবেশ জোটেনি তার ভাগ্যে। তাই আজও তেমন বিশেষ কষ্ট হয় না। তবুও প্রথম-প্রথম কয়েকটা দিন তার সেই উদ্ধত অপূর্ব শান্তশ্রী যেন খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

এ-বাড়িতে এসে কিছুদিন যেন একটা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সময় কাটল। আজ সব নীরব, সকল শান্তি।

তবুও কখনও কখনও অবসর সময়ে বুকের ভিতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠত। একটা অব্যক্ত ব্যথা, একটা আশঙ্কা, একটা অজানা অভাব যেন কিছুক্ষণের জন্য ভারাক্রান্ত করে রাখত।

আজকাল প্রায় সময়ই বাইরে থাকছে মিতা। বাইরের পরিবেশে হেম লজের শূন্যতা স্তব্ধতা যেন ভুলে থাকতে সুবিধে হয়। তবুও যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ সে একা।

এমনি কাটছিল দিন।

অবাক হল সেদিন। একসঙ্গে সকল চাকর-চাকরানীরা মিলে সরকার মশাইকে সঙ্গে করে হাজির হল মিতার কাছে।

—ব্যাপার কি, সরকার মশাই? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে মিতা।

মাথা নীচু করে সরকারমশাই বললেন,—এরা সকলে চাকরি ছেড়ে যেতে চাইছে।

সরকার মশায়ের কথায় মিতার সামনে যেন বজ্রপাত হয়। একই

সঙ্গে চৌদ্দজন ঝি-চাকর চাকরি ছেড়ে যেতে চায়? এদের ঔদ্ধত্য ক্ষমার অযোগ্য। সাপের মাথায় পা দিয়ে মাড়িয়ে যেতে চায়? এক মুহূর্তে শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে।

—চাকরি ছেড়ে যাবে এবং সকলে একসঙ্গে। কেন, কি হয়েছে ওদের?

তেমনি নত-মস্তকে জবাব দেন সরকার মশাই,—তা ত জানি না, তবে ওরা যাবে বলছে।

মিতার চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে আগুনের শিখা,—যেতে দিন ওদের। মাইনে চুকিয়ে দিন সকলের। যতসব অকৃতজ্ঞ!

—কিন্তু,—মাথা চুলকে বললেন সরকার মশাই,—দত্তবাবু বলে গিয়েছিলেন, কোনও ঝি-চাকর যদি কাজ ছেড়ে যেতে চায়, তাহলে তাঁকে না জানিয়ে যেন এক পয়সা মাইনে না দেওয়া হয়।

—বেশ, আমি টেলিফোনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি। ওদের যেতে বলুন।

মিতা উঠে ওর ঘরে এসে বিলাস দত্তকে টেলিফোন করতে তিনি 'আসছি' বলে লাইন কেটে দিলেন। এবারেও অবাক হল মিতা।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিলাস দত্ত এসে পৌঁছলেন।

মিতা লাইব্রেরীতে বসে অপেক্ষা করছিল।

—আসুন জ্যাঠাবাবু। চাকরগুলো সকলে একসঙ্গে চলে যেতে চাইছে কেন বলুন ত?

বিলাস দত্ত একখানা চেয়ারে বসে এক মিনিট নীরব থেকে বললেন,—যেতে চাইবার কারণ ত আমি কিছু জানি না, মা। তবে যাবার আগে আমাকে জানাবার উদ্দেশ্য একটা আছে বলেই আমি সরকার মশাইকে বলে গেছিলাম।

—কি সে উদ্দেশ্য?

—তোমার বাবার উইল অনুসারে যে-কোনও চাকর চাকরি ছেড়ে যাবে, তাকে নগদ এক হাজার টাকা দিতে হবে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে উঠে মিতা,—উইল? বাবা আবার উইল করলেন কবে?

—যেদিন মারা যান সেইদিন।

—তা এতদিন আমাকে জানাননি কেন?

—জানাইনি তোমার মনের অবস্থা দেখে। ভেবেছিলাম, তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তারপর জানাব। আমার কাছে উইলের নকল আছে ইচ্ছা, করলে দেখতে পারো।

—দিন, দেখি।

বিলাসবাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা লম্বা খাম বের করে মিতার হাতে দিলেন। কম্পিত হাতে কাগজটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে যায়। বিলাসবাবু চুপ করে মিতার মুখ-মুদ্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। পড়া শেষ হলে মিতা কাগজটা বিলাসবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে,—ইম্‌পসিব্‌ল! আপনারা প্রতিশোধ নিতে চান আমার সঙ্গে? বেশ চেষ্টা করে দেখুন। আপনার হাতেই ত সব, যা খুশী করুন।

ইতিমধ্যে চাঁপা চায়ের ট্রে সামনে রেখে যায়। মিতা নিজের হাতে কাপে চা ঢেলে বিলাসবাবুর সামনে এগিয়ে দেয়।

বিলাসবাবু চলে গেলেন। মিতা সরকার মশাইকে প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ দিয়ে এসে নিজের ঘরে বসে ভাবতে থাকে।

॥ চার ॥

শীতের ঝরাপাতার মত একটি একটি করে দিন বয়ে যেতে থাকে। নিরুদ্বেগ মিতার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর মত উড়ে চলেছে অসীম নীলাকাশের গায়ে।

জীবনটা ভোগের জন্য। তাকে যদি ভোগই না করতে পারল তবে জন্ম হল কেন? সকল রকম সুযোগও রয়েছে হাতের কাছে প্রচুর, অফুরন্ত। তাই মিতা জীবনের প্রতি মুহূর্তেই মূল্য কষে কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেয়।

ইতিমধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি মিতার জীবনে।

বিলাস দত্ত বৈষয়িক মানুষ। আইনের ব্যাপারী। তিনি হাল ছাড়তে পারেন না। নানাপ্রকারে মিতাকে হাত করবার চক্রান্ত করে বেড়ান দিনরাত। কোন প্রকারে কিরণের সঙ্গে বিয়েটা দিতে না পারা পর্যন্ত তাঁর যেন সোয়াস্তি নেই। নিয়মমত প্রতি সপ্তাহে একদিন তিনি আসেন মিতার কাছে। নানা কথার আলোচনা করেন। নানা 'প্রসঙ্গের হয় অবতারণা। কখনও বা মেয়ের মত বোঝান, আবার কখনও বিশ্বস্ত এটর্নির মত বৈষয়িক আলাপ হয়। কখনও কখনও মিতার অনুরোধ এড়াতে না পেরে মিতার সঙ্গে বসে খেয়ে যেতে হয়।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিই মিতার মনকে টলাতে পারেনি।

উইলের সংবাদটা ইতিমধ্যে এক-কান থেকে পাঁচ-কানে উঠেছে। মিতার বন্ধু-বান্ধব মহলে তাই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা।

প্রণয়প্রার্থীরা ছদ্মবেশে মিতার আরও কাছে-কাছে এসে

ভীড় করে। ওর কদর বাড়ে শতগুণে। নানা অছিলায় পার্টি পিকনিক আর নেমন্তন্নর চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। উপহারের স্তূপ জমতে জমতে পাহাড়প্রমাণ উঁচু হয় যেন।

নির্বিকার মিতা অতি সহজভাবেই সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে যায়, আর মনে-মনে হাসে পুরুষগুলোর বাড়াবাড়ি বা মূর্খতা দেখে।

হবেই বা না কেন? একই সঙ্গে ডবল হিট্। রাজ্য এবং রাজকন্যা। কোন হিরো চান্স পাবে, তার কোনও চিহ্নই ফুটে ওঠে না মিতার ব্যবহারে। তবুও প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়তে থাকে দিনের পর দিন।

॥ পাঁচ ॥

সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময়ের অপেক্ষা সকলেই করে। সময় বয়ে যাবেই।

মিতারও প্রতীক্ষার দিন একটি একটি করে শীতের ঝরাপাতার মত ঝরে গেল।

আর মাত্র তিনটি দিন বাকি।

এখনো মনস্থির করতে পারেনি মিতা। তাই মনটা যেন অত্যধিক চঞ্চল হয়ে উঠছে দিন দিন।

তবে কি ওকে মাথা নীচু করতে হবে? তবে কি অপরের ইচ্ছার সমুদ্রে ওকে ভাসিয়ে দিতে হবে? তবে কি ওর কোন মূল্য, কোন নিজস্ব সত্তাই নেই?

মিতার বাদামী চোখের তারায় ঝিলিক মেরে ওঠে আগুনের ফুলকি। হাত দুটো দৃঢ়মুষ্টি করে লাইব্রেরী রুমের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে।

স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করতে হলে চাই প্রচুর অর্থ। অর্থের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত মান-সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি। আজ যদিও অর্থহীন হয়ে যায় তাহলে সমাজে ওর কানাকড়িও মূল্য থাকবে না। আজ হোক, কাল হোক, সেই পুরুষের জিদের কাছেই বিলিয়ে দিতে হবে। তার খেয়ালের আগুনে ইন্ধন জোগাতে হবে নিজেকে। অর্থ ছাড়া ভাবা যায় না সে-জীবনকে। আর সেই অর্থকে করায়ত্ত করতে হলে বাবার জিদের কাছে মাথা নীচু করতে হবে।

ওকে বিয়ে করতে হবে।

সম্পূর্ণ সনাতন রীতিতে বিয়ে হওয়া চাই। নইলে সবকিছু হারাতে হবে।

অথচ এত অল্প সময়ের মধ্যে পতি নির্বাচন করাও ত এক মহা-সমস্যা। বিয়ে করতে হবে বলেই ত আর যার তার সঙ্গে ঝুলে পড়া যায় না।

অর্থের লোভে পাত্রের অভাব হবে না। তারপর ঐ অর্থই বাধিয়ে বসবে অনর্থ। মিলনের শুরুতে বিচ্ছেদের বীজ বোনা হবে। তাতে হবে কলঙ্ক। আর সেই কলঙ্কই পরবর্তী জীবনে পুরুষের কাছে ওকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। আজ যারা লোভের বশবর্তী হয়ে ছুটে আসছে, কাল আর তাদের কাছে থাকবে না সে আকর্ষণ। দূর থেকে দেখে তারা হাসবে।

কিন্তু উপায়ই বা কি এখন ?

বিলাস দত্ত শেষবার ওর মতামত জানবার জন্য মিতার বাড়িতে আসে। যদিও বিলাস দত্ত মিতার সম্বন্ধে শেষ বোঝা বুঝে নিয়েছে। ও মেয়ে ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

পুরুষ জিদ করলে উন্নতি হয়, আর মেয়েরা জিদ করলে জাত যায়। এই প্রবাদটা বার-বার বিলাস দত্তর মনে পড়ে। তবুও ওর কিছু করবার নেই। মিতা যে ধরনের মেয়ে তাতে গায়ে-পড়ে কিছু

বলতে যাবার অর্থই হ'ল গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া। মিতা যদি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতে চায় ত তাকে বাধা দেওয়া নিস্ফল। বাধা যে মানে না তাকে বাধা দেবে কে?

তবুও শুধু শেষবার আসার প্রয়োজনেই বিলাস দত্ত মিতার বাড়িতে আসে। বলবার জন্য অবশ্য 'কর্তব্যরক্ষা' শব্দটা ব্যবহার করবে বলেই ধরে নেওয়া যায়।

এইবার নিয়ে তিনবার হ'ল মিতার কাছে আসা।

প্রতি বারই একই ফল ফলেছে। কিছুতেই রাজী নয় ও।

এবারেও বিলাস দত্তকে দেখে মিতার বুঝতে দেরী হল না তার আসার উদ্দেশ্যটা কি। তবুও শিষ্টাচার রক্ষা করতে মিতা দরজা অবধি এগিয়ে গেল।

—আসুন জ্যাঠাবাবু, বসুন।

—বসছি, মা, বসছি। তারপর কি সংবাদ বলো।

—আপনি কেমন আছেন বলুন।

সামনের সোফাটায় বিলাস দত্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়,

—আর থাকাথাকির কি আছে মা, দিন কাটছে কোন রকমে। তারপর তোমার জন্য আজ ক'দিন মনটা কেমন করছিল তাই চলে এলাম। ভাবলাম, দেখে আসি আমার মিতা-মাকে।

—বেশ ত, আমিও আজ আপনার কথা ভাবছিলাম।

—তা তোমার বিষয় কি ঠিক করলে, মা?

—এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি।

বাইরে খুব সাদা-সিধে ভাব দেখালেও মনের মধ্যে কেমন যেন দুরু-দুরু করতে থাকে। কি জানি, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে লেখা আছে কোন্ ইঙ্গিত। হাতের বইখানা বন্ধ করে পাশের কর্নার টেবিলটার উপর সশব্দে রেখে বলল মিতা,—আমিও ক'দিন খুব

ভাবছি। কিন্তু এখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারিনি। ভাবছি আর ভাবছি শুধু। আজ এবং কালও ভাবব বলে ঠিক করেছি। অতএব এই সময়টুকু অপেক্ষা করুন। শেষ অবধি আমাকে ভাবতে দিন। বিয়ে না করলে যখন সকলের অসুবিধে হবে তখন আপনাদের কথাই শুনব। তবে একেবারে শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত আমি দেখব।

—তোমার ইচ্ছার উপর জোর করতে চাই না, মা। তোমার বাবার শেষ অনুরোধটা ভুলতে পারি না, তাই বার-বার তোমাকে বিরক্ত করছি। বৃদ্ধ হয়েছি, এই দীর্ঘদিনে আমার জীবনে বহু মানুষের সঙ্গে মিশেছি। বহু মানুষের উত্থান-পতন দেখেছি। আজ আঠারো-কুড়ি বছর ধরে এত বড় এষ্টেটটা আমার হাতে রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে আসছে। তাই এর উপর একটা মায়া পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। চোখের সামনে আজ তুমি এত বড় ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিতা হবে, একথা ভাবতেও বুকটা ফেটে যায়। অবশ্য একথা আজ ইন্দ্র বেঁচে থাকলে তাকে আমি বলতাম না বলবার প্রয়োজনও হত না। আমার মন বার-বার বলছে, তুমি ভুল করছ, তাই তোমাকে না বলে পারছি না। কিরণকে আর তোমাকে ত আলাদা করে ভাবতে পারি না···

—না না জ্যাঠাবাবু, আমিও তা ভাবি না। আপনি এলে বরং আনন্দিত হই। জীবনে আপনজনের স্নেহ-মমতা ত কখনো পেলাম না। বাবার পর 'কেমন আছো' কথাটাও জিজ্ঞাসা করতে কেবলমাত্র আপনিই রয়েছেন। কিন্তু জ্যাঠাবাবু, কেন জানি না, আমি আমার মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না।

কিছুক্ষণের জন্য কারো মুখে কোন কথা নেই। মিতা জানালা দিয়ে দূরের সাগুগাছটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। এতদিন পর মিতা আজ সত্যিই তার মনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য চেষ্টা করছে।

বিলাসবাবু হাতের লাঠিটার উপর পর-পর দুটি হাত রেখে আঙুলগুলি ইতস্ততঃ নাড়াচাড়া করতে-করতে কি ভাবছিলেন। অতঃপর তিনিই মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন,—তোমার জন্য যে কতখানি চিন্তায় পড়েছি আমরা, তা আর কি করে বোঝাব। ছেলেমানুষ, এই এত বড় পাহাড়পুরীর মধ্যে একলাটি থাকতে তোমার মন কেমন হয় তার খানিকটা অনুভব করতে পারি বৈকি। যাই হোক, এখনো তিনদিন বাকি আছে। ভেবে দেখ। দরকার হলে আমাকে টেলিফোন ক'রো। আমি তোমার মতামতের জন্য চিন্তিত রইলাম। আচ্ছা তাহলে এখন উঠি, মা।

বিলাসবাবু উঠে দাঁড়াতে মিতাও উঠে দাঁড়ায়।

—আচ্ছা জ্যাঠাবাবু। চলুন নীচে অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না না, আমি একাই যাচ্ছি। তুমি আবার কষ্ট করে নীচে কেন যাবে?

বিলাসবাবু বেরিয়ে যেতে মিতা আবার চিন্তা করতে বসে।

বিকেলে কয়েকজন টেলিফোনে মিতার সঙ্গে কথা বলতে চাইল কিন্তু সকলকেই 'বড্ড ব্যস্ত আছি' বলে লাইন কেটে দিয়েছে।

তারপর অনেকক্ষণ যাবৎ আলমারি খুলে বই ঘাঁটাঘাঁটি করে কতকগুলি বই বের করে। আবার সেগুলি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পিছনদিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ বাগানের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে। তারপর এক পা দু' পা করে বাঁ দিকের কোণের লম্বা সোফাটার উপর গিয়ে বসে।

ধীরে ধীরে দিনের আলো ম্রিয়মাণ হয়ে যায়, সন্ধ্যা নেমে আসে পৃথিবীর বুকে।

গত কয়েকদিন যাবৎ গুমোট গরম পড়েছে। দু-একখণ্ড কালো মেঘ আকাশের কোণে জমছে বটে তবে তা থেকে এখুনি কিছু বলা যায় না বৃষ্টি হবে কিনা। ঝির-ঝির করে হাওয়া আসছে বাগানের দিক থেকে। তার সঙ্গে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘোর হয়ে আসে। চারিদিকের বিজলী বাতিগুলি জ্বলে গেছে অনেকক্ষণ। এখনো দোতলার একটিও লাইট জ্বলেনি। নন্দর মা এসে ওদিকের বারান্দার লাইটগুলি জ্বেলে দিয়ে এদিকের বারান্দায় এসে মিতাকে এমনি চুপ করে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়।

—এই অন্ধকারে বসে আছো কেন গো দিদিমণি ?

—ঠিক আছে, আজ অন্ধকারটাই যেন ভালো লাগছে। তোমায় আলো জ্বালতে হবে না। দরকার হলে আমিই জ্বেলে নেব'খন। আর হ্যাঁ, আমার খাবারটা আমার ঘরে টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে যাস। আমার জন্য কাউকে জেগে থাকবার দরকার নেই, তোরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়িস।

নন্দর মা চলে যায়।

মিতার ঘরের গ্র্যাণ্ডফাদার-ক্লকটাতে আটটা বাজল। কর্মক্লান্ত পৃথিবী ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে। পাশের গলির শেষে কোন্ বাড়িতে বিয়ের বাজনা বাজছে। বি. টি. রোডের উপর থেকে মাঝে-মাঝে মোটর গাড়ির হর্ন-এর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এত বড় বাড়িটায় মাত্র কয়েকজন ঝি-চাকর ছাড়া মিতা একা।

পায়চারী করতে-করতে কিছুক্ষণ পরে পা দুটো যেন ধরে আসে। অগত্যা সোফাটার উপর বসে পড়ে।

মনের মধ্যে একে একে হাজার চিন্তা একসঙ্গে যেন জট পাকিয়ে উঠতে থাকে। এ চিন্তার শেষ নেই যেন। নিত্যকালের মত আজকের এই রাত্রিও শেষ হবে। আসবে আগামী কাল। তারপর পরশু। এমনি করে দেখতে-দেখতে তিনটে দিন কেটে যাবে।

তারপর ?

হয়ত এ সমস্যার সমাধান হবে না।

তাহলে ?

শহরে ওর ভবিষ্যৎটা কি এমনি মরুময় হয়ে যাবে ?

না না, তা হতে পারে না। অসম্ভব, কিছুতেই হতে পারে না। ওকে বাঁচতেই হবে। সমাজের মধ্যে পাঁচজনের মত, এতদিন যেমন মাথা উঁচু করে রয়েছে, তেমনি বাকি জীবনটা ওকে বাঁচতেই হবে।

রাত নটা-দশটা কখন বেজে গেছে মিতার খেয়াল নেই। ঘরের ঘড়িটা এবার এগারোটা ঘোষণা করে।

নীচের তলায় পাতাবাহার গাছের উপর রান্নাঘরের জানালা দিয়ে যে আলোটা এসে পড়েছিল, নিভে গেল।

নিশ্চয় চাকর-বাকরগুলোর খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। এবার ওরা ঘুমিয়ে পড়বে, আর এই পাষাণপুরী 'হেম লজ' নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে যাবে।

পুকুরপাড়ের আমগাছটার মাথার উপর একটা পাখীর ডানা ঝট্পটানির শব্দ। ওরাও এবার ঘুমাবে। কিন্তু মিতার চোখে ঘুম নেই।

আকাশটা যেন কালো হয়ে উঠেছে। বাদলা মেঘ ধীরে-ধীরে জমতে শুরু করেছে। বাদলা হাওয়ার পরশে মনে হয় কোথাও যেন বৃষ্টি হয়েছে।

ঢং ঢং ঢং···

বারোটা বাজল। এখনো দরোয়ানটার গলা শোনা যাচ্ছে। ওর দেশী ভাষায় গান গাইছে: 'রসিয়ারে না যাইহো বিদেশবা।' চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। বাতাসে ভেসে আসছে হাস্নুহানার গন্ধ।

একটু-একটু করে সময় বয়ে চলেছে।

দুটো বাজল। মিতার অপলক দৃষ্টি আকাশের বুকে।

এমন সময় গলির দিক থেকে 'চোর' 'চোর' শব্দ শোনা যায়। কতকগুলি লোক যেন চোরকে তাড়া করে নিয়ে আসছে। মিতার ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। কিন্তু কোলাহলটা হেম লজের পাঁচিলের কাছে এসে যেন থেমে গেল। কেউ বলছে,—মোড়ে পুলিশ পাহারা আছে, ওদিকে যায়নি। কেউ বলছে,—এই পর্যন্ত আসতে দেখেছি।

তারপরই চুপচাপ আবার সবকিছু নিস্তব্ধ। নিঝুম রাতে একটানা ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক।

হঠাৎ নীচের পাতাবাহার গাছের মধ্যে সর-সর শব্দ হতে মিতার দৃষ্টি যায় সেইদিকে। একটা মানুষ যেন বেরিয়ে ঠাকুরঘরের দিকে যাচ্ছে। এবার নীচের তলায় আলো জ্বলে উঠল। একটা কুকুরের ডাকও শোনা গেল। নিশ্চয় চাকর-বাকরগুলি জেগে উঠেছে। ওরা বলাবলি করছে: চোরটা বাড়িব মধ্যে ঢুকে পড়েনি তো?

এমন সময় বারান্দার শেষদিকে ঘোরানো সিঁড়িটা বেয়ে লোকটাকে ছাদের দিকে উঠতে দেখা গেল।

তবে কি চোরটা ছাদের উপর দিয়ে পালাবে?

না, লোকটা আবার নেমে এল তিনতলার বারান্দায়। ওদিকে নন্দর মা'র গলা শোনা গেল। বোধ হয় উপরে উঠে আসছে।

লোকটি একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। আবার সোজা এইদিকেই চলে আসছে। মিতার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এবার বুকটা কাঁপতে শুরু করেছে। যদি সোজা এসে ওর গলা টিপে ধরে?

আবার ভাবে, দেখাই যাক না। হাজার হলেও চোর ত। ওদিকে নন্দর মা উপরে আসছে বোঝা গেল।

লোকটা সোজা এসেই মিতার সামনে দাঁড়ায়। একমুহূর্ত কি ভেবে পাশের খোলা দরজা দিয়ে মিতার শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে মিতা যে জেগে আছে অন্ধকারে বোধ হয় টের পায়নি।

ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত নয় ভেবে মিতা এক লাফে ঘরে ঢুকেই ডানদিকের দেয়ালে হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দেয়।

সমস্ত ঘরখানা এবার দিনের মত উজ্জ্বল আলোয় ভরে যায়।

লোকটা তখনো পিছন ঘুরে দেখবার সুযোগ পায়নি।

—দাঁড়াও!

বজ্রকণ্ঠে আদেশ করে মিতা।

লোকটা যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে চমকে উঠে পিছনে ঘুরে দাঁড়ায়।

--আমাকে বাঁচান, আমি চোর নই। বিপদে পড়েছি, দয়া করুন।

ধ্বক্-ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে তেজস্বী মেয়ে মিতার বাদামী চোখের তারা—তুমি চোর নও?

—না। আমি সব বলছি।

লোকটি হাত জোড় করে দাঁড়ায় অপরাধীর ভঙ্গিতে।

ওদিকে দরজায় নন্দর মা ধাক্কা মারছে।

—দিদিমণি, ও দিদিমণি, দরজাটা খোল একবার, বাড়িতে বোধ হয় চোর ঢুকেছে।

ঘরের মধ্যে দুইজোড়া চোখ তখন অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একজোড়া চোখে করুণা-প্রার্থনার ভাব। অন্য জোড়ায় কৌতূহল।

—কি হয়েছে নন্দর মা? একটু চিৎকার করেই জিজ্ঞাসা করে মিতা।

—বাড়িতে নাকি চোর ঢুকেছে। একটু দেখেশুনে শোও বাপু, কি জানি একটা জলজ্যান্ত মানুষ এর মধ্যে কোথায় ডুবে গেল কে জানে!

—এদিকে কেউ আসেনি গো নন্দর মা, আমি জেগেই রয়েছি।

—আচ্ছা।

নন্দর মায়ের চলে যাবার শব্দ শোনা গেল। মিতা বসল ওর বিছানার উপর।

লোকটা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে মিতার দিকে। দেখতে অনেকটা পাগলের মত। মুখভর্তি দাড়ি। উস্কো-খুস্কো তেলহীন লম্বা চুলের রাশি মাথায়। ধূলি-মলিন চেহারা। একটা তেলচিটে পায়জামা আর একটা ছেঁড়া হাফসার্ট পরনে। খালি

পা। তবে শরীরের গঠনাদি বেশ লম্বা-চওড়া। সারা দেহে দরিদ্রতার ছাপ।

কি ভেবে বিছানা থেকে নেমে আসে মিতা। শিয়রের দিকের দেওয়ালে একটা ফটো আটকানো রয়েছে : সেটা ধরে চাকার মত ঘোরাতে সেটা খুলে আসে। আসলে সেটা একটা চোর-কুঠুরী। তার ভিতর থেকে পিস্তলটা বার করে যথাস্থানে বসল। লোকটি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। এবার মনে হল সে যেন একটু ভয় পেয়েছে।

—ঐ চেয়ারটাতে বসো।

মিতার কণ্ঠে আদেশের সুর। লোকটি যন্ত্রচালিতের মত চেয়ারটাতে গিয়ে বসে।

—কোথায় থাকো ?

—থাকার কোন ঠিকানা নেই। নম্রভাবে জবাব দিল লোকটা।

—নাম কি তোমার ?

—নামটা নাই বা জানলেন। শুধু জেনে রাখুন, আমি চোর নই।

—তা তো দেখলেই বোঝা যায় যে তুমি চোর নও, সাধু। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। বলো, তোমার কে আছে ?

লোকটি নিরুত্তর।

—কতদিন চুরি করছ ? মিতার কণ্ঠস্বর আরো একটু কড়া। অপর পক্ষ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে মিতা এবার ভীষণ রেগে যায়,—তুমি আমার কথার জবাব দেবে না ?

—আপনার কথার জবাব নেই আমার কাছে। আরো নম্রভাবে উত্তর দেয় আগন্তুক।

—বুঝেছি। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। পুলিশের গুঁতো খেলেই সব বেরিয়ে আসবে পেট থেকে।

মিতা উঠে টেবিলের উপর থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নেয়। একটা চোর, তার এতখানি স্পর্ধা যে মুখের উপর কথা বলবে ?

—হ্যালো···বরানগর পুলিশ ষ্টেশন !···এন্‌গেজড ? থ্যাঙ্কস্‌ !

মিতা রিসিভারটা নামিয়ে রাখে, কিন্তু ধরে থাকে হাত দিয়ে।

লোকটি এবার ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। হাত জোড করে এগিযে আসে মিতার দিকে,—আমি. মিনতি করছি, আমাকে দয়া করুন। আমাকে পুলিশে দেবেন না, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি চোর নই। ওরা শুধু-শুধু আমাকে অপদস্থ করছে।

—হোয়াট্‌ ? চিৎকার করে ওঠে মিতা,—তুমি চোর নও ? তাহলে এত রাত্রে তোমাকে পাড়ার লোক 'চোর চোর' করে তাড়া করে নিয়ে এল কেন ? আর কেনই বা তুমি রাত্তের অন্ধকারে একেবারে আমার ঘরে এসেছ ?

—মিথ্যে অপমানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আপনি আমাকে আর যা খুশী শাস্তি দিন।

—আচ্ছা ! মিতা এবার আরো ভালো করে তাকায় লোকটির দিকে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে কয়েকবার ঘরের মধ্যে পায়চারী করে। যেন খুব গম্ভীর একটা চিন্তা করছে। ডানহাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা রয়েছে পিস্তল। মিতা ভাবে, লোকটা হয়ত চোর নাও হতে পারে। হয়ত অন্য কোন ব্যাপার হবে। তাই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। কিন্তু এই অবস্থায় ওর কি রহস্য থাকতে পারে ?

হঠাৎ লোকটির সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় মিতা। অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাকায় ওর দিকে। কি যেন বুঝতে চেষ্টা করে।

—অল্‌রাইট ! তোমাকে পুলিশে দেব না।

—বাঁচালেন। তার চেয়ে বরং আমাকে গুলী করে মেরে ফেলুন।

মিতার মেজাজ এবার সপ্তমে ওঠে,—তোমার ভয় করছে না ?

—আজ্ঞে না, আপনি যে অভয় দিলেন। আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। আর মাত্র ঘণ্টা দুয়েক দয়া করুন।

সকাল হবার আগেই আমি চলে যাব, নইলে আবার ওরা আমাকে ধরবে।

—থামো! অত যদি ধরা পড়বার ভয় ত চুরি করতে আসার সময় মনে ছিল না? তাছাড়া তুমি কি মনে করেছ তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যই রিসিভার নামিয়ে রেখেছি?

—আজ্ঞে···। ইতস্তত: করে আগন্তুক।

— মরতে তোমার ভয় লাগে না? প্রশ্ন করে মিতা।

—না।

—কেন?

—কারণ বেঁচে থাকবার যাদের অধিকার নেই তাদের মরতে ভয় লাগে না। আমি চোর নই বলে পুলিশের ভয় করেছিলাম: অনাহারে-অবিচারে জর্জরিত আমি, এর উপর অপবাদের জ্বালা সহ্য করবার আগে আমি মৃত্যুই কামনা করি।

—মাই গুডনেস্! মিতার চোখ দুটো ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে যেন,—তুমি ত বেশ কথা বলতে জানো হে! কতদূর লেখাপড়া করেছ?

—আজ্ঞে বাংলা কাগজটা কোনমতে পড়তে পারতাম, তাও ভুলে গিয়েছি।

—তোমার আর কে আছে?

—কেউ নেই।

—লেখাপড়া কতদূর জানা আছে?

আগন্তুকের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

—কেন, লেখাপড়ার বইয়ের উপর কি আমার শাস্তির বহর নির্ভর করছে?

—যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও। মিতার কণ্ঠস্বর গম্ভীর,—নইলে বাধ্য হব তোমাকে পুলিশে দিতে।

—দেখুন, আজ যে পরিবেশে আমি আপনার সামনে এসেছি

তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা-চারেক ডিগ্রির কি মূল্য আছে বলুন?

—হোয়াট্‌ ননসেন্স ইউ আর টকিং! চোরের মুখে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম উচ্চারণ করা মানে ব্ল্যাকমেলিং।

—আজ্ঞে না, আমি বোধহয় অন্যায় কিছু বলিনি।

—আর ঐ পলার আংটিটা বুঝি নবগ্রহের শান্তির জন্য?

—সে ত দেখতেই পাচ্ছেন। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আপনি খুব উত্তেজিত হয়েছেন। আমি বরং বাকি দুটো ঘণ্টা বারান্দায় বসে কাটিয়ে দিচ্ছি।

মিতা অবাক হয়ে আগন্তুকের কথাবার্তায়। একজন চোরের পক্ষে এমন সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলা আশ্চর্যই লাগে। যাই হোক, লোকটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ওকে দিয়ে তার মহান স্বার্থ রক্ষা করা যেতে পারে। সমগ্র জগতের কাছে ছোট হওয়ার চেয়ে একটা বিপদাপন্ন মানুষকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করে নেওয়া অনেক সুবিধাজনক। লোকটি মরতে রাজী আছে কিন্তু পুলিশে যেতে রাজী নয়। ওর এই দুর্বলতার পিছনে নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য রয়েছে। আর সেই সুযোগই গ্রহণ করতে হবে ওকে।

অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে নিঃসন্দেহে।

যদি রাজী না হয়?

তাতেই বা ক্ষতি কি? একটা অপরাধীর মুখ বন্ধ করতে এতটুকু অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।

অতএব ওকে একবার যাচাই করেই দেখা যাক।

—শোনো, আমার মনে হয় তুমি ভদ্রসন্তান এবং খুবই বিপদে পড়েছ। মিতার কণ্ঠস্বরে কোমলতা, কিন্তু অন্তরের অভ্যন্তরে জ্বালামুখীর আগুন জ্বলছে।

—আপনার অনুমান ঠিক।

মিতার হঠাৎ পরিবর্তনে আগন্তুক মনে-মনে একটু আশ্চর্য হয়।

—তোমাকে আমি এই মুহূর্তে ভীষণ বিপদে ফেলতে পারি তা তুমি স্বীকার করো ?

—নিশ্চয় করি।

—আর যদি এখন ছেড়ে দিই ?

—আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

—কিন্তু না, আমি অত সহজে তোমাকে ছাড়তে পারি না। ক্ষুধিত সিংহের গহ্বরে একবার ঢুকে বেরিয়ে যাওয়া অত সহজ নয়।

—জানি।

—হ্যাঁ, তবে ছাড়তে পারি যদি তুমি আমার একটা শর্ত রাখো। নইলে তোমাকে শায়েস্তা করতে আমার কোনো অসুবিধাই হবে না।

—তাও জানি, কিন্তু শর্তটা কি ?

—অনেক টাকা দেব তোমাকে। সারাজীবন তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি কল্পনা করতে পারবে না এত টাকা তোমাকে দেব।

—প্রস্তাবটা যদিও অবিশ্বাস্য তবুও আমার দ্বারা সম্ভব কিনা তা বিচার করে দেখতে হবে। বলুন—

—কিন্তু তোমাকে কেন, পৃথিবীর কোন পুরুষকেই আমি বিশ্বাস করি না।

—বড়লোকদের অমন হয়েই থাকে। আপনার দোষ দেওয়া যায় না।

—ননসেন্স! তুমি কি বলতে চাও ?

—আজ্ঞে আপনার কথার জবাবে যা বলা উচিত আমি শুধু তাই বলছি। এবার দয়া করে আপনার শর্তটা বলুন।

—একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে তোমাকে। বিনিময়ে যত টাকা দেব তা তুমি একসঙ্গে কখনো চোখেও দেখনি।

—একটা ছোট্ট কাজের জন্য অত টাকা আপনি আমাকে দিয়ে দেবেন ? এবার কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চাইছে না।

মিতা এবার ক্ষেপে যায় যেন,—স্কাউণ্ড্রেল, তুমি হয়ত জানো

না, তোমার মত দু-দশটা জীবনের কোন দামই নেই আমার কাছে।

—আপনারা বড়লোক, অর্থের জোরে সব করতে পারেন স্বীকার করছি। তাছাড়া যে অবস্থায় আপনার ঘরে এসে ঢুকেছি, এখন আমি সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন। আমার একটি মাত্র প্রার্থনা, আমাকে ছেড়ে দেবেন।

—নিশ্চয় দেব এবং আমার কথামত কাজ করলে তোমাকে বড়লোক করে দেব।

—কাজটা কি চুরির অপরাধের চেয়েও সাংঘাতিক ?

—না, অত্যন্ত সহজ ও সরল। বিনিময়ে সোনার ভবিষ্যৎ।

আগন্তুক এবার একটু হাসল। ওর চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ মিতার চোখ এড়ায় না। অথচ লোকটি আগের চেয়ে অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে।

—কি, কথা বলছ না যে ? আমার কথার জবাব দাও, আমার সময় কম।

—বলুন, ভেবে দেখি।

—আগে বলতো, আমি দেখতে কেমন ?

আগন্তুক হঠাৎ মুখ তুলে তাকায় মিতার দিকে। আশ্চর্য হয়। এমন অদ্ভুত মেয়ে পৃথিবীতে আছে বলে তার জানা নেই। সে এখনো বুঝতে পারেনি মিতা পাগল কি না।

—কই, জবাব দাও! উত্তেজিত হয়ে ওঠে মিতা।

—আজ্ঞে অপরূপ সুন্দরী। মাথা নীচু করে উত্তর দেয় আগন্তুক।

—এবার শোনো আমার শর্তের কথা। তোমাকে অনেক—অনেক টাকা দেব, বিনিময়ে আমাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।

যেন সাপে কামড়েছে এমনভাবে আগন্তুক লাফিয়ে উঠল। মুখ দিয়ে যেন ভাষা সরছে না, তবু অনেক কষ্টে জিভ দিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে আমতা-আমতা করে।

—এবার তোমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে আমি পাগল, তাই না?

—আজ্ঞে না। আগন্তুক বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-ওদিক তাকায়।

—তবে কি? জবাব দাও।

—আজ্ঞে আমাকে কয়েক মিনিটের জন্য ছেড়ে দিন, আমি রাস্তার চাপা-কলটা থেকে একটু জল খেয়ে আসি।

—ইম্‌পসিব্‌ল্! তোমাকে ছেড়ে দিলেই তুমি পালিয়ে যাবে। ঐ টেবিলে জলের গ্লাস ঢাকা রয়েছে, খেয়ে নাও। হ্যাঁ, খিদে পেয়ে থাকলে ঐ খাবারটাও খেয়ে নিতে পারো, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। আমার সময় খুব কম।

আগন্তুক এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে ঢাকনা তুলে জলের গেলাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলে জল।

—শোন! মিতা এগিয়ে যায় টেবিলের কাছে,—ঐ চেয়ারটাতে বসে কিছু খেয়ে নাও। ভয়ের কিছু নেই, আমার কথামত কাজ করলে তোমার ও আমার উভয়ের লাভই হবে। তুমি যা ভাবছ, অর্থাৎ পাগল নই। তুমি খেতে বসো, আমি সব কথা তোমাকে বলছি। তোমার পোষাক-পরিচ্ছদের অবস্থা বাদ দিয়ে তোমাকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়।

আগন্তুক চেয়ারে এসে বসতে মিতা খাবারের প্লেটটা এগিয়ে দেয়। আগন্তুক একমুহূর্ত কি ভেবে নেয়। প্লেটের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে একটা লুচি তুলে নেয়। মিতা লক্ষ্য করে ওর চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল চক্‌-চক্ করছে।

লোকটা হয়ত সত্যিই চোর নয় এবং ক্ষুধিত। অবস্থা-বিপাকে পড়ে হয়ত আজ এমনি পরিবেশে আসতে বাধ্য হয়েছে।

—শোন, আসল ব্যাপারটা তোমাকে খুলে বলি। এই যে বাড়ি দেখছ, এ ছাড়া আমার বাবার প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। তিনি নিজে ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, অথচ আমাকে বিলাতী

শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মারা যাবার আগে এই সব সম্পত্তির উইল করে গেছেন, যদি আমি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে খাঁটি হিন্দুধর্মানুযায়ী বিবাহ না করি তাহলে তাঁর এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে আমি বঞ্চিতা হব। আমি বিবাহ করতে রাজী নই অথচ সম্পত্তি হাতছাড়া করা চলে না। তাই সেই বয়সের মধ্যে আমাকে অন্ততঃ অস্থায়ীভাবে বিয়ে করতে হবে। বিবাহের আর মাত্র তিনটে দিন বাকি, তাই তোমাকে যখন পেয়েছি, একটা চান্স দিতে পারি। বল, জবাব দাও, আমার সময় খুব কম।

—যদি আমি রাজী না হই, তাহলে কি আমাকে পুলিশে দেবেন?

—তার চেয়েও কঠিন শাস্তি আমার জানা আছে। রাজী তোমাকে হতেই হবে, তোবার দাবীর কথা বল।

আগন্তুক এক মুহূর্ত ভেবে নিল।

—বিয়ে তাহলে আপনাকে করতেই হবে?

—হ্যাঁ, শুধু আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য। তাই তুমি আমাকে শর্তাধীনে বিয়ে করবে। একমাত্র টাকা ছাড়া তোমার আর কোন দাবী থাকবে না। বিয়ের পনের দিন বা একমাস পরে তোমার টাকা বুঝে নিয়ে ডিভোর্স সই করে দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবে সারা জীবনের মত। কোনদিন কোন দাবী চলবে না। এমন কি, পরিচয় দিতেও পারবে না। ভুলে যাবে বাংলাদেশে তোমার কোন স্মৃতি আছে।

—আইডিয়াটা ভালো। কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার ভাববার জন্য আমাকে সময় দিতে হবে।

—নো, একটুও সময় পাবে না। খিদে পেলে ঐ খাবারটা খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করছি।

—ওটা ত আপনার খাবার।

—তা হোক, আমার ক্ষিদে নেই, তুমি খেয়ে নাও।

—তা হয় না। দেখুন, আমি সত্যিই গত দু'দিন যাবৎ কিছু

খাইনি। গরীব নিঃসন্দেহে এবং বর্তমানে অবস্থা-বিপর্যয়ে আপনার হাতের মুঠোয়, কিন্তু এখনও আমি জ্ঞান হারাইনি। আপনি না খেলে আমি খেতে পারি না।

মিতা রাগে যেন ফেটে পড়তে চায়। অন্য কোন সময় হলে এতক্ষণ একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু এখন অতখানি রাগ শোভা পায় না।

—ননসেন্স! আমার কথার অবাধ্য হলে তোমাকে চাবকে পিঠ লাল করে দিতে পারি। যাও—খেয়ে নাও।

আগন্তুক টেবিলের সামনে বসে আবার পিছন ফিরে মিতার দিকে তাকায়। বড্ড করুণ দৃষ্টি ওর চোখে। কি যেন বলতে চায়। অতঃপর বলেই ফেলল,—একটা কথা বলব?

—বলো।

—আপনার সব কথাই ত আমাকে শুনতে হবে, কিন্তু আমার একটা কথা আপনি যদি রাখেন ত বড় খুশী হব। অন্ততঃ একটু কিছু খেয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে নিন।

লোকটিকে আরো ভালো করে চেয়ে দেখল মিতা। এবার যেন ও আর ওর স্বভাব-অনুযায়ী খেঁই করে রেগে উঠতে পারল না। অগত্যা এগিয়ে গিয়ে দুধের গ্লাসটা তুলে নিল নিজের হাতে।

—বেশ, আমি দুধটা খাচ্ছি, তুমি খাবারগুলো খাও।

আগন্তুক সামান্য কিছু খেয়ে জল খেয়ে ফিরে বসে। মিতা ওরই দিকে তাকিয়ে ছিল।

—বলো তুমি কি চাও।

—সবচেয়ে আগে আমাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিন। তারপর দাবীর কথা বলব। তবে আমি কথা দিচ্ছি, আমার দাবী খুব সাধারণ দাবীই হবে।

ওয়াল-ক্লকটাতে ঢং ঢং করে চারটা বাজল। পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। বাগানের দিক থেকে পাখীদের কিচির-মিচির

শব্দ ভেসে আসছে। বি. টি. রোডের উপর দিয়ে চলে-যাওয়া মোটর গাড়ির আওয়াজ শোনা যায় মাঝে-মধ্যে।

মিতা উঠে টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবির গোছাটা বার করে একটা আলমারি খুলে একখানা কাচানো ধুতি, একটা গেঞ্জি, একখানা সিল্কের চাদর বার করে বড় সোফাটার উপর রেখে দিয়ে বলল,—সকাল প্রায় হয়ে এলো, ঐ বারান্দায় শেষে ডানদিকে বাথরুম আছে, স্নান করে এসে এই ধুতি-গেঞ্জিটা পরে নাও। ওগুলো আমার বাবা সর্বদা ঘরে রাখতেন।

লোকটিও আর বাক্যব্যয় না করে উঠে দাঁড়ালো।

মিতা বারান্দায় এসে বাথরুম দেখিয়ে দিতে লোকটি ভিতরে ঢুকল।

কিছুক্ষণ বাদে আগন্তুক স্নান সেরে ফিরে আসে। লাইব্রেরী-ঘরের সামনে মিতা দাঁড়িয়েছিল। আগন্তুক সামনে এসে দাঁড়াতে মিতা হাত দিয়ে ঘরে ঢুকতে ইশারা করে।

আগন্তুক ঘরে ঢুকে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

—ঐ ডীভানটাতে বসো। মিতার কণ্ঠে আদেশের সুর,—কেমন লাগছে এখন ?

—মন্দ নয়। সংক্ষিপ্ত জবাব আগন্তুকের মুখে।

—এখন ত আর পুলিশের ভয় নেই ?

—না, তবে মিলিটারী পুলিশের ভয় আছে।

মিতা হো-হো করে হেসে ওঠে। লোকটির সদম্ভ উত্তরে মনে-মনে একটু বুঝি ক্ষুণ্ণও হয়। তবে কি ভেবে মিতা চুপ করে যায়।

স্নান করা ফর্সা চেহারা। লোকটিকে যেন দেখতে ইচ্ছে করে। শুধু লম্বা-লম্বা অবিন্যস্ত চুল আর মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফগুলি ওর চেহারাকে যেন বিকৃত করে রেখেছিল। এখন ওর দিকে হঠাৎ তাকালে ওকে যোগী বলে মনে হয় যেন। এবার যেন ওর সম্বন্ধে

ভাবতে ভালো লাগছে। সাজালে-গোছালে ওর স্বামী বলে নেহাৎ বেমানান হবে না বলেই মনে হয়। তা হোক, ক'দিনেরই বা মামলা? তাছাড়া আর কেই বা ওদের বিয়ের কথা জানছে? আইনের মুখে থাপ্পড় মারবার জন্য খবরের কাগজে দু-লাইন খবর ছাপানো দরকার, ব্যস।

আগন্তুক সামনের ডীভানটার উপর চোখ বুজে বসে আছে। হাত দু'খানা কোলের উপর আলতোভাবে রাখা। চোখে-মুখে অনেকখানি প্রশান্তির ছাপ। কতদিন যাবৎ অন্ন জোটেনি বা স্নান করেনি কে জানে। তাই মুখখানা শুকিয়ে গেছে। চোখের কোণটা যেন কালো-কালো। শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এমন সময় নন্দর মা চায়ের ট্রে নিয়ে উপরে এলো। লাইব্রেরীতে আলো জ্বলতে দেখে ট্রে হাতে লাইব্রেরীতে ঢুকে দেখে, মিতা একটা মোটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। নন্দর মা অন্যদিকে না চেয়ে মিতার সামনে রাখা টী-টেবিলের উপর ট্রে-টা রেখে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে,—ওমা, দিদিমণি কখন উঠেছো?

—তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল। আর শোন, চা আরো লাগবে, আমার গেষ্ট আছেন। ভদ্রলোক প্রায় পাঁচ বছর পরে বোম্বে থেকে ফিরেছেন। সারারাত ট্রেনে জেগে এসেছেন, অত্যন্ত ক্লান্ত। সকাল-সকাল কিছু খাবার ব্যবস্থা করে আমার পাশের ঘরটিতে শোবার ব্যবস্থা করে দে। আমারও রাত্রে ঘুম এলো না বলে বসে-বসে বই পড়ছিলাম, এমন সময় এসে হাজির। আত্মভোলা মানুষ, আর ভীষণ লাজুক। সোজা উপরে এসে হাজির। যাই হোক, তুই আর খানিকটা চা নিয়ে আয়।

নন্দর মা লোকটির দিকে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মিতা উঠে লোকটির মাথায় হাত দিয়ে আস্তে ধাক্কা দিতে লোকটি চমকে উঠে সোজা হয়ে বসে। কয়েক মুহূর্ত তার কেটে যায় নিজেকে সামলে নিতে।

—সকাল হয়েছে, চা খেয়ে নাও। ধীর স্বরে বলল মিতা।

—হ্যাঁ, দিন। শরীরটা বড্ড ক্লান্ত তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাফ করবেন।

—ঠিক আছে। তোমার জন্য আমার পাশের ঘরটা গুছিয়ে দিতে বলেছি। এক ঘণ্টার মধ্যে তুমি ওখানে গিয়ে সাড়ে-দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে শরীরটাকে একটু সুস্থ করে নাও। তারপর আমরা বেরুব মার্কেটিং-এ। কিন্তু তোমার নামটা এবার আমার জানা দরকার।

আগন্তুক ইতস্তত: করে হঠাৎ কিছু বলতে। নাম বলতে কোথায় যেন একটা বাধা রয়েছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে উত্তর দেয়,—আমার নাম তমাল সেন।

—ভেরী গুড নেম ইনডিড। আমার নামও ত তোমাকে জানতে হবে।

—আমি জানি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর যুবকের মুখে।

—কেমন করে তুমি জানলে আমার নাম? আশ্চর্য হয় মিতা।

—বইতে লেখা দেখেছি।

—মাই গুডনেস্। তুমি দেখছি পাকা গোয়েন্দা।

—এতে গোয়েন্দার কি আছে? একটু দূরদৃষ্টি থাকলেই হয়

কিছুক্ষণ পরে নন্দর মা এসে খবর দেয় বাবুর থাকবার ঘর তৈরী।

মিতা উঠে দাঁড়িয়ে তমালকে বলে,—চলো তোমার ঘরটা তোমাকে দেখিয়ে দিই।

দু'জনে গিয়ে ঘরটা দেখে নেয়।

সুন্দর সাজানো-গোছানো আধুনিক রুচিসম্পন্ন ভাব। সবতাতেই

যেন একটা বিলিতিয়ানার ছাপ। উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা। হু-হু করে হাওয়া আসছে। উত্তর দিকের জানালা দিয়ে দূরে ডানলপ ব্রিজটা দেখা যায় খানিকটা।

সামনেই বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তমাল নিজের চেহারাটা সম্পূর্ণ দেখতে পেল। আবাক হয়ে যায় নিজের চেহারার পরিবর্তন দেখে। পরনে ধুতি-গেঞ্জি আর গায়ে সিল্কের চাদর। পাট করা লম্বা চুল আর মুখে দাড়ি। মাত্র দুটি মাসে একটা মানুষের এতখানি পরিবর্তন হতে পারে ভেবে আশ্চর্য হয়। তমাল কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি ওর জীবনে এত বড় বিপর্যয় আসতে পারে।

এক মুহূর্তে ওর চোখের সামনে দিয়ে চলচ্চিত্রের মত ওর জীবনের দৃশ্যগুলি যেন একে একে সরে যেতে থাকে। প্রত্যেকটি ঘটনা যেন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কে জানে অজানা ভবিষ্যতে আরো কি হতে চলেছে।

মিতা বুঝতে পারে তমাল আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ওর অবস্থার কথা ভাবছে। ওকে এখন অন্ততঃ দু-একটা দিন একটু আদর-যত্ন করতেই হবে। ও যাই হোক, ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই শেষ মুহূর্তে এসে ধরা দিয়েছে মিতার সমস্ত ভবিষ্যৎকে রক্ষা করতে। হয়ত প্রচুর টাকা দাবী করবে। কত টাকা ও চাইবে? বিশ হাজার? পঞ্চাশ হাজার? এক লাখ? না—তার চেয়েও বেশী? তবুও তমালের মত লোককে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। মিতা জানে ওকে এমন অবস্থায় প্রথমতঃ কেউ বিশ্বাস করত না, আর টাকার লোভে কেউ রাজী হলেও শেষ মুহূর্তে সে বিশ্বাসঘাতকতা করত অথবা তার কাছ থেকে মুক্তি পেতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হত। দু-চারটে দিন বই তো নয়।

—কি ভাবছ? মুচকি হেসে মিতা তাকায় তমালের দিকে।

—ভাবছি কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়নার দিকে মুখ করেই উত্তর দেয় তমাল।

—যা গত হয়ে গেছে তাকে টেনে লাভ আছে কিছু?

—পৃথিবীতে সবকিছুই ত গত হয়ে যাবে, তবুও তার সব কিছুকেই কি ভুলে যায় সকলে?

—ভুলে যাওয়াই উচিত। কারণ মৃত অতীতকে মনে করে শুধু শুধু কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কি থাকতে পারে?

—তবুও অতীতের মধ্যেই থাকে বর্তমানের সমাধান।

—সমাধান ত হয়েই গেছে। এবার ভুলে যাও না কেন।

—কোথায় সমাধান হ'ল?

এবার তমাল ঘুরে দাঁড়ায় মিতার মুখোমুখি—সমস্যার ত শুরু হ'ল সবে।

মিতার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে তার স্বভাবজাত কুটিল হাসির বাঁকা রেখা। কোমরে হাত দিয়ে যেন আরো একটু সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তমাল লক্ষ্য করে ওর স্লিপিং গাউনটার ভিতরে বুকটা যেন একটু বেশী জোরে ওঠা-নামা করছে।

—ও, তাহলে তুমি এখন আমার প্রস্তাবে রাজী নও?

—কথা যখন দিয়েছি তখন নিশ্চয় রাজী। আপনি ভয় পাবেন না। তবে দয়া করে আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবেন না।

—বেশ, তোমার দাবীর কথাটা এবার বলো।

—তার জন্য অত ভাবছেন কেন? আগে আপনার কাজ হয়ে যাক, তারপর যা হয় ভেবেচিন্তে দেখা যাবেখ'ন।

—সার্টেনলি নট। আগে তোমাকে বলতে হবে।

—Please, আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন। তারপর ইচ্ছা হয় আপনি পুলিশ ডেকে দেবেন।

—All right, you better take rest। তারপর··· তারপর আমি দেখছি কি করা যায়।

মিতা চলে যেতে-যেতে দরজার কাছ অবধি গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে

বলল But, mind that —এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করো না, তাহলে তার পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হবে।

মিতা বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

তমাল এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে চাদরটা খুলে পাশের সোফাটার উপর ফেলে দিয়ে বিছানার উপর গিয়ে শুয়ে পড়ে।

যা হবার হবে। আগে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।

মিতা স্নানপর্ব শেষ করে জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে নন্দর মাকে ডেকে খাবার দেবার কথা বলে দেয়। তাছাড়া গাড়ি নিয়ে ড্রাইভারকে তৈরী থাকবার কথা বলে।

তারপর সরকার মশাইকে ডেকে কিছু টাকা উপরে পাঠিয়ে দিতে বলে নিজের শেষ প্রস্তুতিটুকু সেরে নেয়। বিলাস জ্যাঠাকে একবার খবর দেওয়া দরকার মনে করে তক্ষুণি টেলিফোন করে জানিয়ে দেয় আগামী কাল ম্যারেজ রেজেষ্ট্রী অফিসে গিয়ে বিয়েটা রেজেষ্ট্রী করে আগামী পরশু একটা ব্রাহ্মণ ডেকে যা যা করবার হয় যেন ব্যবস্থা করে দেন। এও জানিয়ে দেয় যে, পাত্র ঠিক হয়ে গেছে এবং সে আপাততঃ এখানেই আছে।

তমাল ঘুম ভেঙে উঠেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে এগারোটা বাজতে মিনিট বারো বাকি। হঠাৎ ওর নজর পড়ল সোফার উপর ওর চাদরটার উপরে একটা ক্যাপস্টান সিগারেট টিন আর একটা দেয়াশলাই।

আর কথা নয়।

আগে গিয়ে টিনটা খুলে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে পর পর দু-চারটে টান দিতে যেন মাথাটা ছাড়ল।

উঃ, যেন কত যুগ একটা সিগ্রেটের মুখ দেখেনি!

চোখ বন্ধ করে একের পর এক সিগ্রেটে টান দিয়ে চলেছে তমাল। মাঝে-মাঝে দু-একবার ধোঁয়াটা যেন গলার মধ্যে খুস-খুস

করে ওঠে। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে আবার টান দেয়।

ধীরে ধীরে স্মৃতির দুয়ার খুলে একে একে গত দু-মাসের সব ঘটনাগুলি মনে পড়তে থাকে। মনে পড়ে কাল রাতের সকল ঘটনাগুলি।

কি হতে কি হয়ে গেল।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এমন নারীর কথা ত জীবনে কখনো শুনিনি। নিজের স্বার্থের জন্য এমন নির্লজ্জ ভাবে নির্দয়ের মত ব্যবহার করতে পারে?

রাত্রে মিতা যতটুকু প্রকাশ করেছিল, তেমন অবস্থায় পড়লে হয়ত পারে।

এমন সময় ঘরে ঢুকল মিতা।

তমাল তখনো চোখ বন্ধ করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেছে। সমস্ত ঘরখানা যেন ধোঁয়াতে ভরে উঠেছে।

—হ্যালো মিঃ সেন, গুড মর্নিং! শ্লেষভরা স্বরে বলল মিতা।

লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তমাল অভ্যর্থনা জানায় মিতাকে,—আসুন। ছোট্ট উত্তর তমালের কণ্ঠে।

আমি ত এসেই আছি। এখন চল কিছু মার্কেটিং করে আসি। কিন্তু তার আগে তোমার শর্তটা আমাকে জানাও আর তোমার জেনে রাখা দরকার যে, আগামী কাল তুমি একজন মিলিওনিয়ারীজএর পতি হতে চলেছ। অতএব অনেক কিছু তোমাকে আগে থেকে Rehearsal দিয়ে নিতে হবে।

—বেশ, আমি তৈরী। কিন্তু শর্তের কথাটা যদি এখনই জানতে চান তাহলে শুনুন, আমি আইন পড়তে বিলেত যাবো, সে বাবদ যা কিছু প্রয়োজন হয় সব খরচ আপনি বহন করতে বাধ্য থাকবেন। অবশ্য লিখিতভাবে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

—হোয়াট ননসেন্স ইউ আর টকিং? তুমি বিলেত যাবে আইন পড়তে? কতখানি তোমার এখানকার এডুকেশন?

—ব্যারিস্টারি পড়তে হলে আগে যতখানি এডুকেশন দরকার ততখানি নিশ্চয় আছে।

তমালের কথায় মিতাকে কেউ যেন সপাং সপাং করে চাবুক মারছে বলে মনে হল।

—আই সি, তাহলে যে সে চোর তুমি নও দেখছি!

—চোর আমি সত্যিই নই।

—সাট্ আপ! আমি সব শুনেছি। কাল রাত্রে নাগদের বাড়িতে বিয়ের পর তুমি খিড়কি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিলে, কিন্তু বেশীদূর এগোতে পারোনি। বলো, একথা মিথ্যে?

—আংশিক সত্যি, তবে উদ্দেশ্য……

—ড্যাম ইট! উদ্দেশ্য কি তা জানবার জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা না করলেও আমি বুঝতে পারি।

—তাহলে আপনি আমার শর্তে রাজী নন? রুক্ষ স্বর তমালের কণ্ঠে।

তমালের ঔদ্ধত্যে মিতা রাগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। হয়ত খানিকটা কেটে যেতেও পারে। যাই হোক, আগে কাজটা উদ্ধার হোক, তারপর দেখা যাবে।

—বেশ, তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো তাহলে আমিও রাজী। এখন বেলা এগারোটা, কিছু খেয়ে নিয়ে তৈরী হও। এখনই আমরা একবার বেরুব।

—আমি তৈরীই আছি।

—বাইরে গিয়ে আগে পোশাকটা বদলে নিয়ে তারপর যা করতে হয় করা যাবে।

—কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। আমার এই পোশাকেই চলবে।

—কি বলছ তুমি? এই একমাথা চুল, একমুখ দাড়ি নিয়ে পাগলের মত আমার সঙ্গে বেড়াবে নাকি?

—সেটা আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আমাকে নিয়ে বেড়াতে যদি আপত্তি থাকে তাহলে বেড়াবেন না। আমি বাড়িতে থাকি, আপনি র আসুন।

—তাহলে তুমি সাধু সেজে থাকবে?

-হ্যাঁ।

--অলরাইট। বি রেডি, তারপর দেখা যাক কি হয়।

মিতা বেরিয়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে নন্দর মা সামনের টেবিলটার উপর খাবার রেখে যায় বেরিয়ে যেতে-যেতে নন্দর মা বলল,—দাদাবাবু! আমি দরজার পাশেই আছি, কিছু দরকার হলে আমায় নন্দর মা বলে ডাক দিও।

—আচ্ছা।

নন্দর মা বাইরে যেতে তমাল খেতে বসল।

এ এক অদ্ভুত জীবন। এমনভাবে কখনো তাকে খেতে হয়নি। খাবার সামগ্রীগুলোও বেশ নতুন ধরনের।

সুব্রতদের বাড়িতে সুব্রতর মা খেতে দিতেন মাটিতে আসন পেতে। যতক্ষণ খাওয়া না হত নিজে সামনে বসে জোর করে খাওয়াতেন। ছোট থাকতে মা হারিয়ে মায়ের স্নেহ-যত্নের অভাবটুকু বাবা ভবানীপ্রসাদ সেন-এর বাল্যবন্ধুর স্ত্রীর কাছে অনুভব করতে পারেনি। সুব্রতর মাকে ছোটমা বলে ডাকতে পেয়ে 'মা' ডাকেরও অভাব মিটিয়ে নিয়েছিল।

আজ দীর্ঘ দুটি মাস তাঁরা কত কি ভাবছেন। ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে। নিশ্চয় তাঁরা জানতে পেরেছেন সব কথা। হয়ত আর কোনদিন তাঁরা ওর মুখ দেখতে চাইবেন না।

খাওয়া শেষ হতে তমাল জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে

বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এমন সময় মিতা ঘরে এসে ঢোকে। তমাল তেমনি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে,—কিছু বলবেন ?

মিতা বুঝতে পারে তার চুপি-চুপি আসা তমালের অজানা নয়। ওর নারীত্বে প্রভুত্বে আঘাত লাগে যেন। তমাল ওকে অবহেলা করেছে। ও কখনোই এ ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারে না। এত' তাহলে জেনেশুনে চুপ করে পিছন ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল ? কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল মিতা,—একজন মহিলা আধঘণ্টা ধরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ভিতরে আসতে বলার মত ভদ্রতাটুকুও শেখোনি ?

ঘুরে দাঁড়ায় তমাল। চার চোখের মিলন হতে দু'জনেরই দেহে যেন একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ খেলে যায়।

কয়েকটি মুহূর্ত। কয়েকটি পলক। কেউ যেন চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি ইতিমধ্যে।

—ঘরটা আপনার' হাসিমুখে বলল তমাল,—আর আমি আপনার স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলির সামগ্রী। আপনারই ঘরে আপনাকে আসতে অনুরোধ করে নকল ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাবে আপনারই অনুকম্পায় আশ্রিত একজন আসামী, এ রকম ভদ্রতা দেখানোতে আমি অভ্যস্ত নই।

—আই সি, এখনো বারো ঘণ্টা পার হয়নি, এরই মধ্যে ফোঁস করতে আরম্ভ করেছ ? জানো, আমি তোমার বিষদাঁত ভেঙে দিতে পারি ?

—আপনি মিছেমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন মিস রয়। ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বলল তমাল,—বিষদাঁত আমার নেই। আর থাকলেও আপনি এখন তা ভাঙতে পারতেন না। কারণ, একটা সামান্য চোরের বিষ-দাঁত ভাঙবার জন্য মূল্য দিতে হবে অনেক বেশী।

—ননসেন্স! দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করে মিতা। রাগে

ওর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে কিন্তু বেশী কিছু বলতে পারছে না। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কাপ-ডিস ভাঙার ঝন্-ঝন শব্দে তমাল চমকে উঠে ছুটে আসে।

মিতার ঘরে এইটুকু সময়ের মধ্যে যেন একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে গেছে। কাপ-ডিস-গ্লাস ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে এগিয়েছে। ইতিমধ্যে চাকর-বাকরেরা সব ছুটে এসেছে। তাদের দেখে মিতা চিৎকার করে ওঠে, -কতক্ষণ আমার খাওয়া হয়েছে, এগুলো নিয়ে যাবার মত লোক কেউ নেই এ বাড়িতে?

নন্দর মা মিতার দিকে তাকিয়ে যেন কি বুঝতে পেরে চুপ ক'রে একজনকে ইশারা করে ঘরটা পরিষ্কার ক'রে দিতে। চাকরটি ঘর পরিষ্কার ক'রে নিয়ে যায়। মিতা টেবিলের উপর থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নেয়। তমাল তেমনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

হ্যালো, কে—জ্যাঠাবাবু? হ্যাঁ, আমি মিতা বলছি। হ্যাঁ, আমি বিবাহ করব এবং আজই। পাত্র আমি ঠিক করেছি। আপনি রেজেস্ট্রীর ব্যবস্থা করুন এখুনি। আর একজন পুরুত ডেকে রাত্রে আমার বাড়িতে হিন্দুমতে মন্ত্র পড়ে বিয়ের আয়োজনও করুন। কি বললেন? কন্যা-সম্প্রদান? ওসব না করবার আপনিই করবেন। ঠিক আছে, আমরা দুটোর মধ্যে ওখানে যাচ্ছি। হ্যাঁ, পাত্র অর্থাৎ আমার ভাবী স্বামী আমার কাছেই বসে আছেন। ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, দয়া করে আমার উপর ছেড়ে দিন। আর হ্যাঁ, আমার দোষ-ত্রুটিগুলো নিজের মেয়ে ভেবে ক্ষমা করে নেবেন।

রিসিভার রেখে দেয় মিতা।

এমন সময় ড্রাইভার একগাদা প্যাকেট নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে মিতা টেবিলের উপর রাখতে বলে। ড্রাইভার সেগুলি রেখে চলে যায়। মিতা তমালের দিকে তাকিয়ে বলে, —ভিতরে এসে বসতে পারো না?

তমাল ভিতরে এগিয়ে গিয়ে সোফাটায় বসে। মিতা প্যাকেট-গুলি খুলে একটা ঘড়ি বার করে তমালের দিকে এগিয়ে দেয়।

—নাও এটাকে হাতে পরো। দেখ পছন্দ হয় না কি। আগে হাতে পরে তারপর নেড়েচেড়ে দেখবে।

তমাল দ্বিরুক্তি না করে ঘড়িটা হাতে বেঁধে নেয়। ওর জন্য জামা কাপড় অনেক-কিছুই এসেছে। মিতা সেগুলিকে সরিয়ে রেখে ড্রয়ার খুলে এক বাণ্ডিল নোট বার করে পার্সের মধ্যে রাখতে রাখতে বলল—তা সাধু সেজে থাকবার যদি ইচ্ছে হয় থাকো, তবে ঐ সিল্কের পাঞ্জাবীটা পরে নাও আর সোনার বোতামগুলো লাগিয়ে নাও। ভুলে যেও না, আর কয়েক ঘণ্টা বাদে তুমি আমার আইনতঃ স্বামী হতে চলেছ। মান-ইজ্জত তোমার না থাকতে পারে, আমার আছে। তাই যা বলছি মুখ বুজে করে যাও।

তমাল আদেশ পালন করে নির্বিবাদে।

পোর্টিকোতে গাড়ি ছিল। মিতা তমালের সঙ্গে নীচে নেমে এসে গাড়িতে ড্রাইভিং সীটে বসে তমালকে বসতে বলল, কিন্তু তমাল যেন কিছু শুনতে পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে পিছনের সীটে গিয়ে বসে।

হেম লজ ছেড়ে গাড়ি বি. টি. রোডে আসতে মিতা গাড়ি থামিয়ে তমালকে সামনে এসে বসতে বলল, তমালও কিছু না বলে সামনে গিয়ে বসে।

—তখন যে সামনে এসে বসতে বলেছিলাম তা শুনতে পাওনি বোধ হয়?

—পেয়েছিলাম।

—তাহলে ঐ চাকর-বাকরগুলোর সামনে আমাকে অপ্রস্তুত করলে কেন?

—আমার ঠিক সেই সেন্স ছিল না।

—তাহলে কি সেন্স ছিল?

—কোন অবিবাহিতা তরুণীর অত কাছে বসতে আমার কেমন যেন লাগে।

—তুমি কি সোজা কথা বলতে শেখোনি? দাঁতে দাঁত চেপে বলল মিতা।

—বাঁকা কথা ত আমি জানি না।

শ্যামবাজার ক্রসিং পার হয়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে ওদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। মিতা ওর দিকে না তাকিয়েই চাপা স্বরে বলল —ইচ্ছে করে···

—চাবকে লাল করে দিই, তাই না? তা পারবো, জেল খাটার চেয়ে দু-ঘা চাবুক খাওয়া অনেক সুখের। যাই হোক, এখন দয়া করে বলবেন কি আমরা কোথায় চলেছি?

—ম্যারেজ রেজেস্ট্রী অফিসে। সংক্ষিপ্ত উত্তর মিতার কণ্ঠে।

তমাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—হায় রে বঙ্গবালা!

—কি বললে? বাঁকা চোখে তাকায় মিতা।

—কিছু না। বলছিলাম এমন শুভদিনে একটা ঢাক-ঢোল-শানাই বাজবে না, একটা উলুধ্বনি দেবে না কেউ, কোন এয়োস্ত্রীরা করবে না একটু মঙ্গলাচরণ, কোন গুরুজন এগিয়ে আসবেন না নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করতে, বিনা মন্ত্রোচ্চারণেই শেষ হবে এত বড় অনুষ্ঠান?

—ওসব কুসংস্কার আমার ভালো লাগে না।

—আমার লাগে. বাঙালী হিন্দুর ঘরে জন্মেছি! যুগ-যুগান্তরের নিয়ম, পূর্বপুরুষদের নির্দেশ অমান্য করবার কোন যুক্তি দেখি না।

—ওসব ভণ্ডামী।

—না, পশ্চিমী কুশিক্ষার ফল।

—কোন্‌টাকে তুমি কু-শিক্ষা বলতে চাও?

—প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের ভুল ধরবার ধৃষ্টতা। হিন্দু-ধর্মে দোষ-ত্রুটি যে একেবারে নেই তা আমি বলি না। তবে তাকে

একেবারে অস্বীকার যে করে তাকে বিধর্মী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

—তুমি আমার শিক্ষা-দীক্ষার বিচার করতে চাইছ কোন অধিকারে ?

—আপনি আপনার বাপ-পিতামহকে অস্বীকার করতে চান কোন অধিকারে ?

মিতা আর কিছু বলবার অবসর পায় না। গাড়ি ম্যারেজ রেজেস্ট্রি অফিসের সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিলাসবাবু আগেই এসে পৌঁচেছেন। তিনি বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

—এসো মা। মিতা গাড়ি থেকে নামতে বিলাসবাবু মিষ্টি কণ্ঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। মিতার পিছনে তমাল নামতে মিতা পরিচয় করিয়ে দেয়।

—এই যে জ্যাঠাবাবু, আপনাদের···কথাটা শেষ না করেই অন্য রকম ভাবে কথার রেশ টানে মিতা—যার কথা বলছিলাম। নাম তমাল সেন, আইন পড়তে বিলেত যাচ্ছে।

তমাল এগিয়ে এসে বিলাসবাবুকে প্রণাম করতে তিনি দু'হাত দিয়ে ধরে তমালকে আশীর্বাদ করেন।

চলো বাবা, আর দেরী নয়, শুভস্য শীঘ্রং। ঝামেলাগুলো মিটিয়ে ফেলি এসো।

আর বাক্যব্যয় না করে ওরা বিলাসবাবুর পিছনে পিছনে ভিতরে যায়।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পর সকলে আবার বেরিয়ে আসে।

মিতার মুখে প্রশান্তির রেখা। খুশী মন। বিলাসবাবুর মনের অবস্থা তখন আন্দাজ করা কঠিন। তমালের দাড়িভর্তি মুখের পরিবর্তন চোখে পড়ে না, তবে তাকে দেখলে বেশ গভীর চিন্তায় মগ্ন বলে সহজেই ধরে নেওয়া যায়।

—জ্যাঠাবাবু। গাড়ির দরজা খুলতে-খুলতে বলল মিতা,—বুঝতেই পারছেন এখন কত কাজ করবার রয়েছে। আমি সান্ধ্যাবেলা গিয়ে কাকীমাকে নিয়ে আসব'খন।

—আচ্ছা মা, সেজন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমাকে একবার হাইকোর্ট যেতে হবে। তোমরা এসো, আমি ঠিক সময়মত আসব'খন। অন্যান্য দরকারী কাজগুলো—যেগুলো তুমি জান না সরকার মশাইকে দিয়ে করিয়ে নিও।

বিলাসবাবু তাঁর গাড়িতে উঠলেন। তাঁর মনটা আজ একটু বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একসঙ্গে এত বড একটা শিকার হাতছাড়া হয়ে গেলে কারই বা মনের ঠিক থাকে? মনে-মনে কিরণের উপর রাগও হয় প্রচুর। ছেলেটা একেবারে বাজে।

মিতা স্টিয়ারিং ধরে বসতে তমালও পাশে এসে বসল। মিতা ভাবে, যাক, এবার তবু মানটা রেখেছে।

গাড়ি ছাড়তে খানিকটা দূর গিয়ে মুচকি হেসে বলল মিতা,—এবার বুঝি মনিবের কাছে বসতে লজ্জা করছে না?

– না, এখন আমি আইনতঃ তোমার স্বামী তুমি আমার নব-পরিণীতা স্ত্রী। লজ্জা তোমারই হওয়া উচিত

—উঃ, কী কুক্ষণেই না তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথার সঙ্গে খানিকটা শ্লেষ ছুঁড়ে মারে মিতা।

তমাল তেমনি নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়,—কুক্ষণ বলছ কেন, বলো শুভক্ষণ। নইলে আর কয়েক ঘণ্টা বাদে তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ থাকত না।

– গুড্ গড! ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মিতা তমালের দিকে তাকিয়ে গীয়ার চেঞ্জ করে। প্রত্যেকটি কথায় তমাল ওকে পরাজিত করছে,—এখন ইচ্ছে হলে পিছনে গিয়ে বসতে পারো।

—ও, এখন বুঝি মান কমে যাবে না? তার চেয়ে আমাকে এইখানে নামিয়ে দাও, আমি বাসে করে চলে যাবো। বলেই তমাল

এমনভাবে দরজাটা খুলে ফেলল যে মিতা প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরতে একটা আওয়াজ ক'রে গাড়িটা থেমে গেল।

মিতা কিছু বলবার আগেই তমাল রাস্তায় নেমে সোজা চলতে শুরু করে। মিতার আশ্চর্যের সীমা থাকে না তমালের ব্যবহারে।

অগত্যা মিতা গাড়িটা আরো খানিকটা এগিয়ে নিয়ে বাঁদিকে দাঁড় করিয়ে নেমে দাঁড়ায়। সেইদিক থেকে তখন তমাল এগিয়ে আসছে মিতা ঠিক তমালের মুখোমুখি দাঁড়াতে তমাল থমকে দাঁড়ায়।

—রাস্তার উপর আর কেলেঙ্কারী না বাড়িয়ে দয়া ক'রে গাড়িতে এসো, প্লীজ। ধীর গলায় বলল মিতা।

তমাল একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল দু'চারজন পথচারী ওদের লক্ষ্য করছে। অতঃপর তমাল গাড়িতে গিয়ে বসল। কিন্তু এবার মিতার বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

তমাল স্টিয়ারিং হুইলে হাত দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করছে। ওর ভাব দেখে মনে হয় যেন মিতাকে না নিয়েই ও গাড়ি ছেড়ে দেবে। মিতা তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ করতে-করতে ফুল স্পীডে গাড়ি এগিয়ে যায় শ্যামবাজারের মোড় পার হয়ে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি বি. টি. রোডে এসে পড়ল। তমালের অদ্ভুত চালনা-ভঙ্গী দেখে মিতা কি বলবে খুঁজে পায় না।

হঠাৎ মিতার নজর পড়ে স্পীডোমিটারের দিকে। পঞ্চাশ পার হয়ে তর-তর করে কাটা ঘুরছে।

ষাট···সত্তর···আশী···

—কি করছো! স্পীড কণ্ট্রোল করো। মিতা চোখ বড়-বড় করে দেখে, পাশের গাড়িগুলো হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও বুঝতে পারে, তমাল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে। ওর পৌরুষে কোথাও বুঝি আঘাত লেগেছে।

গাড়ি হেম লজের কম্পাউণ্ডে এসে দাঁড়াতে তমাল নেমে সোজা উপরে উঠে যায়। মিতা পিছনে-পিছনে ঘরে এসে ঢোকে। ততক্ষণে

তমাল সোফার উপরে এসে বসে পড়েছে। হাত দু'খানি উপর দিকে তোলা, চোখ বন্ধ। ঘামে গেঞ্জিটা ভিজে গেছে। মুখখানা লাল টক-টক করছে। নাকের ডগাটা মাঝে-মাঝে ফুলে ফুলে উঠছে, হাতের পেশীগুলো যেন শক্ত হয়ে আছে।

পাখার সুইচটা অন ক'রে মিতা ওর পাশে এসে বসে।

—রাগ করেছো ?

—তোমার উপর ? না। স্পষ্ট অথচ ধীর স্বর তমালের কণ্ঠে।

—তবে কার উপর ?

—আমার অদৃষ্টের উপর।

—বেশ, এখন ওঘরে চলো—খাবার আসবে।

—আমার খাবার ইচ্ছে নেই, তুমি খেয়ে নিতে পারো।

—তা হয় না, তোমাকে আমার সঙ্গে না খেলে দেখতে খুব খারাপ লাগে।

—জোর করলে অবশ্য আমি খেতে বাধ্য। চলো।

আর বাক্যব্যয় না করে মিতার সঙ্গে এসে বসে তমাল।

খাওয়া শেষ করে তমাল নিজের ঘরে এসেই বিছানার উপর শুয়ে পড়ে। মিতা সরকার মশাইকে ডেকে প্রয়োজনীয় কতকগুলি কাজের নির্দেশ দেয়।

সন্ধ্যা উতরে গেছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রায় সকলেই এসে পড়েছেন। বিলাসবাবু সকলের অনুমতি নিয়ে মিতা আর তমালকে ডেকে বড়ঘরে নিয়ে আসেন। সেখানে পুরুত মশাইকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বিলাসবাবুর স্ত্রী। সকলে এসে যার যার আসন গ্রহণ করলে বিলাসবাবু পুরুত মশাইকে ডেকে কাজ আরম্ভ করতে বললেন।

বর-কনের আসনে গিয়ে বসল মিতা আর তমাল।

পুরুত মশাই মন্ত্রোচ্চারণ করলেন।

খাঁটি হিন্দুমতে ওরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। একে একে সকল আচার-অনুষ্ঠান শেষ হয়। অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকই জানল —শুধু জানবার প্রয়োজনে। বয়োজ্যেষ্ঠরা নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন। সমবয়সীরা জানায় শুভেচ্ছা।

এর পর খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ ক'রে যে-যার বাড়ির দিকে যাত্রা করে। তমালের নিখুঁত অভিনয়ে সবচেয়ে আশ্চর্য হল মিতা। অভ্যাগতেরা বুঝল, ওরা যেন কতকালের চেনা। যেন কতদিনের তৃষিত প্রেম সার্থক হয়েছে আজ মিলনে। খুশীতে দু'জন যেন উপচে পড়ছে।

মিতার এক বান্ধবী এগিয়ে এসে বলল,—তোরা একটু পাশাপাশি দাঁড়া ভাই, আমি একটা ছবি নেব। রাত হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

তমালের যেন কিছুতেই আপত্তি নেই। অমনি মিতাকে পাশে দাড় করিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে পোজ নিয়ে দাঁড়ায়। মিতা যেন কলের পুতুল। তমালের ব্যক্তিত্বর কাছে নিজেকে অসহায় মনে হয়। মিতা বুঝতে পারে তমালের এমনি ব্যবহার পুরোপুরি অভিনয়। তবুও ওর স্পর্শ শরীরে রোমাঞ্চ জাগায়। আজ তমালের স্পর্শে এত আকর্ষণ ছিল যে মিতা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। মিতা জীবনে বহু পুরুষের সঙ্গ পেয়েছ কিন্তু তমালের স্বকীয়তার কাছে নিজেকে আজ ভয়াতুর কপোতীর মত মনে হয়। এই সু-নিতম্বিনীর গমন-ধমকে নদীনির্ঝরের চঞ্চলতাকে কে যেন থামিয়ে দিয়েছে। যেন কার উদার নয়নের মণিকর্ণিকার দৃপ্ত তেজ মদিরাপূর্ণ আয়ত লোচনে এনে দিয়েছে নববধূর লজ্জা। তার দুই মৃণাল বাহুর হিল্লোল যেন কোন এক অদৃশ্য পেশীবহুল বাহুর স্পর্শে নিষ্পেষিত হতে থাকে। উগ্র রূপের অধিকারিণী চপলা সালঙ্কারা অভিসারিকার মত সুন্দর মাধুর্য ফুটে ওঠে মিতার কমলাননে।

এ এক নতুন পৃথিবী। এখানকার সব কিছুরই স্বাদ নতুন।

ছবি নেবার এক মুহূর্ত আগে তমাল মিতাকে টেনে নেয় বুকের মাঝে। মিতার বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। এক স্বর্গীয় শিহরণ খেলে যায় শরীরে, ঘন নিঃশ্বাসের সাথে কেঁপে ওঠে তার উন্নত যৌবন-ভার। সেই মুহূর্তে ক্যামেরার ফ্লাশ বাল্‌ব জ্বলে ওঠে দপ্‌ করে।

—ব্রিলিয়ান্ট পোজ হয়েছে রে মিতা! যেন ঋতুরাজ বসন্তের অনুপম স্পর্শে মুকুল-ভূষণা বনলতা প্রাণকান্ত তরুবরে মনেপ্রাণে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। কিছু মনে করিস্ না ভাই, মনের আবেগটা একটু শুদ্ধ বাংলায় কবির স্টাইলে বললাম।

—যাঃ!

ছবি তোলা শেষ হতে তমাল মিতার কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়। আবার দুটি প্রাণী আলাদা হয়ে যায়। এতক্ষণে মিতা যেন সম্বিত ফিরে পায়। এবার ওকে লজ্জায় পেয়ে বসল। মনে-মনে রাগও হয় নিজের উপর।

ওর নারীত্বের ভীষণ পরাজয় হয়েছে আজ। তমাল ওকে জয় ক'রে নিয়েছে।

- তাহলে মিতা, আজ চলি ভাই। মিঃ সেন, আজ বিদায় নিচ্ছি ভাই। পরশু প্রিন্টটা দিয়ে যাবো। তবে হ্যাঁ, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই মিতা, এতদিন আমাদের কাছে ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখে খুব অন্যায় করেছিস্। আগে জানলে আরো খানিকটা হৈ-হল্লা করা যেত।

—ঠিক বলেছেন মিসেস চক্রবর্তী। আপনার বান্ধবীর আর যেন সবুর সইল না। আমি কবে থেকে বলছি, একটা প্ল্যান ক'রে বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে অনুষ্ঠানটা করলে ভালো হয়। তা নয়, ওর কথা—মাত্র ঘণ্টা-কয়েক আগে সবাইকে জানিয়ে অবাক ক'রে দেব।

—তা ভাই, সত্যিই আমরা অবাক হয়েছি ওর বিয়ের সংবাদে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ভেবেছিলাম, ও আজ প্ল্যান ক'রে সকলকে বাড়িতে নিয়ে ঠকাবে আর মজা দেখবে।

—তাই ত বলছি, দিন-কয়েক আগে থেকে একটু খাটলে আজ এমনি নমো নমো ক'রে অনুষ্ঠান শেষ করতে হত না। কি মজা হত বলুন ত? সদরে নহবত বসত সাতদিন আগে থেকে, এত বড় বাড়িটা চমৎকার ডেকোরেটিং হত। লগ্নের ঘণ্ট-কয়েক আগে বরযাত্রীর দল নিয়ে বাজনা বাজিয়ে এসে হাজির হতাম। বেদীর সামনে সাত পাক ঘুরে মালা বদল ক'রে অনুষ্ঠান হত, তারপর শুভদৃষ্টির সময় এক টুকরো সপ্নাজ চাহনি, কি গ্যাণ্ড হত বলুন ত?

—রিয়েলি! বলল মিসেস্ চক্রবর্তী।

—সব কাজে জিদ! বলে তমাল। মিতা দাঁতে দাঁত চেপে মাটির দিকে তাকায়। তমাল আবার চিমটি কাটে,—ঐ দেখুন মিসেস চক্রবর্তী, এবার নিশ্চয় রাগ করেছে। বাব্বা! একেবারে জ্যান্ত মনসা!

তমাল আড়নজরে তাকায় মিতার দিকে। রাগে ফুলে ফুলে উঠছে মিতার শরীর।

—তার মানে? আপনি বলতে চান, সুযোগ পেলে আমার বন্ধু আপনাকে ছোবল মারবে?

—এক্জ্যাক্টলি!

রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ সকলে চলে যায়।

হেম লজ আবার নির্জন হয়ে যায়। তমাল আর মিতা উপরে উঠে আসে। তমাল নিজের ঘরের দিকে যেতে চাইলে মিতা ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে নিজের ঘরে।

—কোথায় চলেছ?

—শুতে।

—আজ আবার ওখানে কেন, আজ আমাদের বাসর-রাত, তা বুঝি জানা নেই?

—আজ্ঞে না। এর আগে আর কখনো বিয়ে করিনি। তাছাড়া আজই বিয়ে হল সবে তার আবার বাসর-রাত্রি কিসের?

— তবে এতক্ষণ ধরে কি হল ?

— বিশেষ অভিনয়।

—অভিনয় হলেও তা আজকের জন্য সত্যি, বাস্তব।

—মোটেই নয়। আইনকে দেখাবার জন্য যা-কিছু করা দরকার, তাই হয়েছে। দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটা সত্যের অনুকরণ, সত্য নয়। তাই দেখে দর্শকরা হাততালি দিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দক্ষতার প্রশংসা করে, সমালোচনা করে কাহিনীকারের লেখনীর, মুগ্ধ হয় ঘটনা-বিন্যাসের কৃতকার্যতায়, বাহবা দেয় নিখুঁত আড়ম্বর অনুষ্ঠানের। আসলে অভিনয়-শেষে তারা ভুলে যায় অভিনয়ের কথা।

—স্টপ ইট প্লীজ! ঐখানে বসো। আচ্ছা, তুমি ত বলছিলে যে তুমি শিক্ষিত। তা তোমার মাথায় এটুকু ঢুকল না যে আজই এত ঘটা করে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিয়ে হল আর কাল সকালে বাড়ির লোকগুলো যখন দু'জনকে দুই ঘর থেকে বেরুতে দেখবে তখন আমাদের সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা হবে বুঝি তাদের ?

—কিন্তু যা সত্যি নয় তাকে নিয়ে টানাটানি করে লাভ কি ? যা আমরা করছি, তাও সত্যি নয়।

—তবুও যতক্ষণ এর প্রয়োজন আছে ততক্ষণ আমরা এমনি করতে বাধ্য। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি তোমার কথার মূল্য দিতে জানো, মাত্রাহীন ভালোও কখনো কখনো মন্দের পর্যায়ে পড়ে।

—তাহলে কি বলতে চাও তুমি ?

—বলতে চাইছি, তুমি ঐ সোফাটায় আর আমি এই সোফাটায় বসে দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব।

—চমৎকার!

—তাহলে তোমার ঐ পুষ্পতনু লোভাতুর কুসুম-শয়নী শুকিয়ে গিয়ে ব্যঙ্গ করবে আমাদের।

আয়তলোচনা মিতা তমালের দিকে কটাক্ষ করে।

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বলল তমাল,—বেশ, এখন রাত হয়েছে তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়তে পারো।

—তাহলে সত্যিই তুমি আমার উপর অভিমান করেছ বলো? বলে মিতা।

– না, অভিমান করব কেন?

—তবে আজ দুপুরে আসবার সময় হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে গেলে কেন?

—তোমাকে রিলিফ দেবার জন্য।

—আর অত জোরে ড্রাইভ করছিলে কেন?

—আমি জোরে চালাতে ভালবাসি। যে জীবনে গতি নেই আর যে গাড়িতে বেগ নেই, আমার কাছে তার কোন মূল্য নেই।

—আর যদি য়্যাক্‌সিডেণ্ট হত?

—সেটা হত আমার কাছে রোমান্স। তাহলে আমার ড্রাইভি সাকসেস্‌ফুল হত।

মিতার চোখ দুটো বড় হয়ে যায় তমালের কথায়। কী সাংঘাতিক লোক! য়্যাক্‌সিডেণ্ট হলে ওর আনন্দ হত?

—তাহলে আমাকে তুমি মেরে ফেলবার চেষ্টা করছিলে?

—ছোটবেলায় বইতে পড়েছিলাম কৃপণের ধন থাকা আর না-থাকা দুই-ই সমান।

—হোয়াট ডু ইউ মিন? মিতা একরকম চিৎকার করে ওঠে।

তমাল কিন্তু নির্বিকার,—যে ফুল ফুটল সে যদি না লাগলো কোন দেবতার পূজায় অথবা না পেল ভ্রমর-সঙ্গ, তার ফোটাও যে কথা আর ঝরে যাওয়াও সেই কথা।

—তুমি যুক্তি দেখিয়ে আমাকে শিক্ষা দিতে চাইছ?

—তোমাকে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার অবমাননা আমি করতে চাই না।

—কিন্তু আমাকে মারতে পারলে প্রচুর ধন পেতে।

—ভুল করছ, তোমাকে না মারলেও এসব ধন-ঐশ্বর্যের আমি

আইনতঃ অধিকারী। কিন্তু সে লোভ আমার নেই। তবে আমাদের কারো একজনের দেহে একটা খুঁত হয়ে থাকলে সেইটাই হত আমাদের সান্ত্বনা।

—সান্ত্বনা?

—হ্যাঁ, বিচ্ছেদের পরবর্তী জীবনে সেই চিহ্নটাই থাকত একমাত্র সম্বল, আর সাক্ষী হয়ে থাকত আমাদের আজকের দিনটা।

—আর কাল রাত্রে চুরি করতে আসাটা? সেটাও কি তোমার জীবনের একটা অ্যাডভেঞ্চার না এক্সপেরিমেণ্ট?

—সে প্রশ্নের জবাব কাল রাত্রেই দিয়েছি তোমাকে। আমার জীবনে যাই হোক, তোমার জীবনে নিঃসন্দেহে দৈবাশীর্বাদ।

হঠাৎ কি একটা মনে পড়তে তমাল পকেট থেকে একটা এনভেলপ্ বের করে মিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—এই নাও, ডিভোর্স ফর্মের উপর আমি সই করে দিয়েছি। খুশীমত তারিখ বসিয়ে নিও।

মিতা খামটাকে নিয়ে পড়ে দেখল সব ঠিক আছে।

মিতা জীবনে অনেক পুরুষের চরিত্র দেখেছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত চরিত্র সে আর কখনো দেখেনি। ও যতবার প্রস্তুত হয় তমালকে পরাজিত করবার জন্য ততবার ওরই অস্ত্রে অত্যন্ত সরলভাবে তমাল ওকে পরাস্ত করেছে।

তমালের মুখের দিকে তাকিয়ে মিতা কি যেন বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু তমালের মুখ নির্বিকার। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

তমালকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মিতা। হয়ত ওর মনের কোণে তমালের জন্য একটু করুণামিশ্রিত মায়া জন্মেছে, কিন্তু তা প্রকাশ করতে রাজী নয়।

বিনা বাক্যব্যয়ে মিতার দেওয়া সম্পর্কচ্ছেদের কাগজে সই করে দিয়েছে তমাল। তার জন্য একটি প্রশ্নও করেনি। এতে মিতার

মন আশ্বস্ত হলেও মনের কোণে কোথায় যেন একটা ব্যথা অনুভব করে।

এটাও মিতার পরাজয় তবুও ওকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কাগজটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে মিতা বলল,—এট আজই দেবার কি দরকার ছিল? তুমি ত আর পালিয়ে যাচ্ছো না, তুদিন পরে আমিই লিখিয়ে নিতাম।

—তুদিন পরেও ত লিখতে হত। তমালের মুখে অবজ্ঞার হাসি

—তা হোক, এমনও ত হতে পারে যে তুদিন পর আমি আমার শর্তের রদ-বদল করতাম।

—এত বড় রিস্ক না নেওয়াই তোমার কাছে স্বাভাবিক। তুদিন পর আমি ভুলও ত করতে পারতাম।

মিতা আবার পরাজিত হয়। তুর্দান্ত প্রতিপক্ষের কাছে নিজেকে মনে হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

—হুঁ! সাধু-বেশী চোর অনেক দেখেছি, আজ চোর-বেশী সাধু দেখলাম। বেশ নতুনত্ব আছে।

—সেটা তোমারই সৌভাগ্য বলতে হবে। সেই চোরের অর্ধাঙ্গিনী বলে অন্ততঃ দশ ঘণ্টাও স্বীকৃতি পেলে।

—এবার মিতা মরিয়া হয়ে ওঠে সোজা হয়ে উঠে বসে সোফার উপর। ওর বাদামী চোখের তারা দিয়ে আগুনের ফুলকি ছোটে যেন। রাগে সমস্ত শরীর থর-থর করে কাঁপতে থাকে।

—তোমার স্পর্ধা ক্রমশঃ বাড়ছে। একদিনেই তুমি এতখানি বেড়েছ! আমারই ঘরে বসে তুমি আমাকে অপমান করতে সাহস পাও কোন্ ভরসায়? এতখানি অহঙ্কার তোমার?

—মিস রয়! অহঙ্কার আমার এতটুকু নেই। তুমি মিছে-মিছে বার-বার আমাকে আঘাত করবার চেষ্টা করছ, ঝগড়া করার চেষ্টা করছ। আমি শুধু আমার প্রতিশ্রুতি পালন করছি। এর পরও যদি তুমি গলাবাজী করে জিততে চাও সেটা তোমার ভুল। আমার

সম্বন্ধে তুমি যাই ভেবে থাকো না কেন, তা সব ভুল। আর ভরসার কথা যদি বলো তাহলে জেনে রাখো, আগে ভরসা করতাম বাবার, এখন একমাত্র ঈশ্বর ভরসা।

— তাহলে তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ নও?

— না, কারণ যা তুমি আমাকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তার বিনিময়ে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছ। অনেক, অনেক বেশী তার মূল্য। কৃতজ্ঞ হতাম গত রাত্রে দয়া করে আমাকে মুক্তি দিলে। আর আমি যা পাবো বলে আশা করছি তা যদি পাই তা সেটা আমার অর্জন করা।

—কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো, আজ যদি আমার বিয়ের প্রয়োজন না থাকত তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ কি হত?

মুচকি হাসে তমাল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দেয়,—তুমি হয়ত জানো মিতা দেবী, আমি সৃষ্টির ব্যতিক্রম। আজকের মত ক্ষমা করো, রাত এখন আড়াইটে, এবার বিশ্রাম করো। আমিও ওঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারি কি না দেখি। কাল থেকে চেষ্টা করবো তোমার সামনে না আসতে, তাহলে হয়ত তোমার হিংসার কারণ হব না।

— না, আজ তোমাকে এই ঘরেই শুতে হবে।

—তথাস্তু। আবার চুপ করে তমাল। মিতার রাগ ও জিদ উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। তবুও এ কয়টা দিন তাকে সহ্য করতে হবে। ওর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা, তমালকে পরাজিত করবেই, কিন্তু ……থাক, আবার কাল দেখব।

তমালের বেশটি অত্যন্ত ভালো লাগে মিতার। তাছাড়া ওর নির্বিকারভাবে কথা বলা, ওর সপ্রতিভতা, নির্ভীকতা, সরলতা এগুলোও মিতার ভালো লাগে।

তাই বোধহয় বার-বার পরাজিত হয়েও ওকে আঘাত করবার সুযোগ ক'রে দেয় নিজেই।

মিতার জীবনে তমাল সত্যিই ব্যতিক্রম।

শুধু তাই নয়, পুরুষ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ও যা ভেবেছিল, তমাল তারও ব্যতিক্রম।

অন্য যে সকল পুরুষের সান্নিধ্যে ও এসেছে তারা সকলেই, এসেছে ওর কাছে করুণাপ্রার্থী হয়ে। ওর একটু কাছে আসতে পারলে যেন তারা নিজেদের ধন্য মনে করত। নকল ভালবাসার অভিনয় করত। অর্থের লুটে আভিজাত্যের কম্পিটিশন।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিযোগিতা দেখে ওর হাসি পেত। তাই একের পর এক তাদের ও আঘাত করেছে, ও তাদের দেখে ব্যঙ্গ করেছে, হেসেছে প্রাণভরে। দামী-দামী গাড়ির ভিড় লেগে থাকত ওকে লিফ্‌ট্ দেবার জন্য।

সোসাইটিতে, ক্লাবে, পার্টি-পিকনিকে মিতা ছিল হাজারে এক।

নাচ-গানে, রূপে-গুণে তাসের টেবিলে মিতা ছিল সমান দক্ষ। তাই ক্লাবের সকলের লক্ষ্য ছিল মিতা। বাইরে মিতাকে রিসিভ করবার জন্য যেমন বিশ-পঁচিশ জোড়া হাত অপেক্ষা করত, তেমনি ভিতরেও শত জোড়া চোখ চাতকপাখির মত অপেক্ষা করত।

মিতা ছিল এতদিন সকলের একমাত্র আলোচনার বস্তু।

প্রথম পরিচয়েই মিতা খানিকটা আন্দাজ করেছিল, তমাল তার স্বভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী। এতদিনের এক রকমের পরিবেশে অভ্যস্ত মিতা আজ সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রকে একেবারেই যেন সহ্য করতে পারে না।

এখনো চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি, ইতিমধ্যে তমালের আচার-ব্যবহারের এমন পরিবর্তন মিতার জীবনে প্রথম। কাল রাতে যে লোকটা চোর বেশে ধরা পড়েছে আজই সে এমন মাথা তুলে কথা বলবে, এতটা আশা নিশ্চয় করেনি মিতা।

প্রথম আলাপেই মিতা বুঝতে পেরেছিল, নিশ্চয় তমাল চোর নয় এবং সাধারণ মানুষও নয়। প্রতিপক্ষ তার চেয়ে শক্তিশালী, কিন্তু

মিতার সুযোগ হ'ল তমালের দরিদ্রতা। তাই ঠিক সেই দুর্বল জায়গায় মিতা বার-বার আঘাত করে ওকে নীচু করতে চেয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে ততবারই সে আঘাত ওর কাছে প্রত্যাঘাত হেনেছে।

নিশ্চয় ওর বিগত জীবনের কোন ইতিহাস আছে। কোন অনভিপ্রেত অযাচিত ঘটনা ঘটেছে, যার জন্যে তমালের মত শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানকে এমনি পরিবেশ টেনে আনতে বাধ্য করেছে।

একদিন তমালকে জিজ্ঞাসা করবে তার কথা। কিন্তু এখন নয়। ও যেদিন চলে যাবে সেইদিন জোর করে ও জেনে নেবে।

ইতিমধ্যে তমাল দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করে দিয়েছে।

তমালের ঔদ্ধত্য যেমন অসহ্য লাগে তেমনি কেন যেন ওকে ভালোও লাগে মিতার। তমালের ঘুমন্ত মুখখানার দিকে এবার প্রাণভরে তাকিয়েদেখে। কোথাও কোন অবিশ্বাসের চিহ্ন নেই।

তমালের দিকে তাকিয়ে দেখতে যেন ভালো লাগে। ওর সঙ্গে মিশে এই একদিনেই মিতা যেন নতুন স্বাদের সন্ধান পায়।

তাহলে মিতা কি মনে-মনে তমালকে ভালবেসেছে?

তাহলে মিতা কি তমালকে যেতে দেবে না? সারাজীবন ওর জীবন-সঙ্গিনী হয়ে থাকবে?

না না, অসম্ভব। চমকে ওঠে মিতা। এ কি সব ভাবছে ও?

পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যু ভালো। তারই করুণাশ্রিত একজন সামান্য মানুষের সম্বন্ধে ও কেন এত ভাববে? তমালকে কোন দিন কোন ক্রমেই মিতা সহ্য করতে পারবে না।

দেহে ও মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। কিছুতেই ঘুম পাচ্ছে না। চুপ করে শুয়ে থাকতেও অসহ্য লাগে।

অগত্যা চুপি-চুপি বারান্দায় এসে পায়চারী করতে থাকে।

তমাল নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

মিতার মনে হয়, ওকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দেয়, আবার ভাবে, না, থাক। ধীরে ধীরে এসে সেই সোফাটাতে বসে পড়ে মিতা।

গতকাল রাত্রে ঠিক এই জায়গায় এমনি সময় মিতা বসেছিল আর তামাল এসে নিজে ধরা দিয়েছিল।

আজ সেই ঘরেই তমাল ঘুমে অচেতন।

আজ আকাশে সামান্য মেঘ করেছে। তবুও পরিষ্কার চাঁদের আলো। কবির ভাষায় বিমল চাঁদনী রাত। নিশুতি, নিস্তব্ধ। বাগানের দিক থেকে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একঘেয়ে ডাক। কোথাও বা দু-একটা পাখীর ডানা ঝট্‌পটানির শব্দ। ধীরে ধীরে বাতাস বয়ে চলেছে, গাছের পাতায় পাতায় তারই শির-শির শব্দ। একখণ্ড হালকা সাদা মেঘ ছুটে চলেছে চাঁদের দিকে। যেন বিরহবিধুরা বিরহিণী বহুদিন পরে তার প্রাণকান্তকে আলিঙ্গন করবার জন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হয়ে ছুটে চলেছে। ঐ ত ওরা পরস্পরে আলিঙ্গন করছে। পিপাসিতা কামিনী যেন প্রেম-পীযূষ পান করে নিজেকে ধন্য করছে। কিন্তু কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র।

তারপরই আবার গোপন অভিসারিণী এগিয়ে যায় আপন পথে। মিতার দেহ রোমাঞ্চিত হয়। আজ ফটো তুলবার সময় তমালের বুকের মধ্যে মাথা রেখে ও অনুভব করেছে তার বুকের স্পন্দন। কী মোহময় সেই মুহূর্তগুলি কেটেছিল!

নাঃ, আর ভালো লাগছে না। তার চেয়ে তমালকে তোলা যাক। যা হয় একটা বোঝপড়া হয়ে যাওয়াই ভালো। তমাল যেমন ভুলে থাকতে পারছে, সেই-বা কেন পারবে না আজকে রাতের কয়েকটা মিনিটের কথা?

তমালের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় মিতা।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। অন্ধকারের ঘোর এখনো কাটেনি। ঘরের দরজা খোলা। রাত্রিশেষের ঠাণ্ডা হাওয়া হু-হু করে আসছে ঘরের মধ্যে। সামনেই বিছানার উপর তেমনি জামা-কাপড় পরা

অবস্থায় শুয়ে রয়েছে তমাল। মিতা সুইচ টিপে সবুজ আলোটা জ্বালতে চোখের উপর থেকে হাত সরায় তমাল।

সামনে দাঁড়িয়ে মিতা। রাত্রিশেষের অবিন্যস্ত বেশ। প্রত্যূষে প্রদীপের শিখাটি যেমন করে পোড়া সলতের কলঙ্ক নিয়ে কাঁদে, তেমনি মুখের অবস্থা।

—বসো। শুয়ে-শুয়েই বলল তমাল।

—চলে এলে কেন? মিতার কণ্ঠে বেদনার আকুতি।

—চলে যাব বলে।

—কোথায় যাবে?

—সে প্রশ্নটা আর নাই বা করলে। এখন ত তোমার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

—তোমার যাবার সময় এখনো হয়নি।

—তবুও আমায় যেতে হবে। তোমার কাছে থেকে তোমার দুঃখের কারণ হতে চাই না আর।

—না তমাল, যে জীবন তুমি ফেলে এসেছ, সে জীবনে আর ফিরে যাওয়া চলে না।

—আমি ভেবে দেখেছি মিতা, মানুষের জীবনের জমার ঘরে সে রেখে যায় শুধু অগুণতি শূন্য, আর দেখা যায় সংসার-বীথির দেনা মেটাতে গিয়ে বেড়ে যায় তার খরচের অঙ্ক। তারপর একদিন স্নেহ-মমতা প্রেম-ভালবাসা, লাভ-লোকসানের এক বিরাট ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে ফিরে যায় আপনার ঘরে। তারপর দেখা যায় সেই মানুষের অবশিষ্ট জনেরা ভুলে যায় তার সকল কথা। অবশ্য তারাও একদিন ঠিক তারই মত বিদায় নেবে এই কেনা-বেচার হাট থেকে। তেমনি তুমি ও আমি একদিন মিলিয়ে যাব এই দুনিয়ার বুক থেকে। সুতরাং……

হাতের সিগারেটা মুখে দিয়ে ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মিতার মুখের দিকে তাকায় তমাল।

—কিন্তু তোমার পাওনা ?

—পাওনা ? যথেষ্ট পেয়েছি, বাকিটার জন্য অনুতাপ করব না।

—না তমাল, ভুল ক'রো না। আমি স্বীকার করছি, আমি নারী। এতদিন যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা মিথ্যা। ধন-দৌলত, রূপ-যৌবন সবকিছু থাকা সত্বেও আমি কত অসহায় তা কি তুমি বোঝ না ? না না, তোমার যাওয়া চলবে না। কথা দাও, তুমি যাবে না।

বার-বার পরাজিত হয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে মিতা। আজ তমাল-বিহীন নিজেকে ভাবতেও পারে না।

তমাল নিরুত্তর।

মিতা আর দাঁড়াতে পারে না। এগিয়ে এসে সোফাটার উপর বসে পড়ে। কারো মুখে কথা নেই। কিন্তু মুখর হয়ে ওঠে ওদের দুটি আত্মা।

সময় কাটতে থাকে।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে টেবিলের উপর টাইম ঘড়িটা বেজে ওঠে।

বেলা আটটা বাজে। সবুজ বাতিটা তখনও জ্বলছে। সামনের বারান্দা রোদ্দুরে ভরে গেছে।

তমাল উঠে জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমের উদ্দেশ্যে বেরুতে গিয়ে দেখে পাশের ডীভানের উপর শুয়ে আছে ক্লান্ত মিতা। মাথাটা একদিকে কাৎ হয়ে পড়েছে। চোখের কোণে জলের দাগ।

তমাল এগিয়ে এসে ওর শিথিল কবরীতে হাত দিয়ে নাড়া দেয়। চোখ খুলে সামনে তমালকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসে অর্ধ-বিবস্ত্রা মিতা। ওর চোখ পড়ে তমালের ডান হাতের দূর্বাসহ হলুদ রঙের সুতাটির উপর। একটা অন্তর্মথিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। ও ভাবে, যেমন করে শিশুরা তাদের খেলার শেষে ভেঙে ফেলে তাদের খেলাঘর, তেমনি ক'রে আর একটু পরেই তমাল ছিঁড়ে ফেলবে ঐ

মন্ত্রঃপূত শাস্ত্রীয় বন্ধন। ভেঙে দেবে তার মিলন-সেতু। উঠে দাঁড়িয়ে তমালকে জিজ্ঞাসা করে,—কতক্ষণ জেগেছ তুমি?

দু'জনেই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

—এই ত মিনিট কুড়ি হবে।

—এতক্ষণ ডাকোনি কেন?

—ইতস্তত: করছিলাম আর তোমাকে দেখছিলাম।

—সো সিলি, আমার ঘুমের সুযোগে আমাকে দেখছিলে? নাঃ, আমার ত মনে হয় তুমি আমাকে দেইতেই পারো না।

সশব্দে হেসে ওঠে তমাল।

—সে অধিকার আমার নেই বুঝি?

—নিশ্চয়। সেইজন্যেই ত মাত্র দুটি দিনেই আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছ।

—মিতা···

মিতার বাদামী চোখের তারায় বিজলীর চমক খেলে যায়। কেঁপে দীর্ঘ অক্ষিপত্র।

তমাল বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

মিতা উঠে ইন্দ্রনারায়ণের ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে বলে,—বাবা! তুমি সত্যিই বলেছিলে চলার পথে চলতে গেলে চাই দিনের আলো। তখন আমি ভাবতাম রাতের মোহই বুঝি আমায় নিয়ে যাবে জীবনের শেষ প্রান্তে। কিন্তু না, সে ভুল আজ আমার ভেঙেছে, সে মোহ কেটে গেছে আজ, আজ আমি পেয়েছি অমৃত পাথেয়।

এমনি ক'রে কেটে যায় দিন, সপ্তাহ, মাস। ইতিমধ্যে তমালকে নিয়ে মিতা অনেক ঘুরেছে। কিন্তু তমাল যেন বোবা। নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া কোন কথার জবাব দিত না।

মিতা বহু চেষ্টা করেছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে তমালের

কাছে। ঝড় ওঠে তমালের অবচেতন মনে, কিন্তু তার চেতন মন এগিয়ে চলে আপন সঙ্কল্পকে অনুসরণ করে। নিজেকে বধির করে রাখে, শুনেও শোনে না দাম্পত্য-জীবনের সোহাগ গুঙ্কার। দৃষ্টিশক্তিকে ঢেকে রাখে কঠোর বাস্তবের উপনেত্রে।

অবশেষে একদিন এগিয়ে এলো বিদায় লগ্ন।

ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে তমালের সাগর পাড়ি দেবার নানা প্রস্তুতি।

আর মাত্র দুদিন বাকি বোম্বাই রওয়ানা হবার। সেখানে দিন-দশেক থেকে তারপর জাহাজ ছাড়বে। তমাল ক্রমশঃ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আর মিতা অত্যন্ত চঞ্চলভাবে তমালের কাছে-কাছে ঘোরাফেরা করছে। তমাল লক্ষ্য করেছে মিতা যেন কিছু বলতে চায়, অথচ জোর ক'রে সেই ইচ্ছাকে দমন ক'রে রাখছে।

আজ সকাল থেকে গোছগাছ শুরু হয়ে গেছে। মিতা নিজে তমালকে সঙ্গে ক'রে অনেক জিনিসপত্র কিনেছে। তমাল মুখ বন্ধ করে দেখেছে শুধু। সন্ধ্যে নাগাদ প্রাথমিক পর্যায় শেষ হয়।

ইতিমধ্যে রাস্তাঘাট, সুখ-সুবিধা বা বৈষয়িক ব্যাপারে দু-একবার আলোচনা হয়েছে ওদের দুজনের মধ্যে।

রাত্রে মিতার ঘরেই খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে তমাল জিজ্ঞাসা করে,—একটা টেলিফোন করব? মিতা আশ্চর্য হয়। এতদিনে তমাল কখনো টেলিফোনের দিকে তাকিয়েও দেখেনি।

নীরব তিরস্কার ফুটে ওঠে মিতার দীঘল নয়নে। হেসে ফেলল তমাল। এগিয়ে যায় টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে নিতে কিছুক্ষণ বাদে ওপার থেকে ভেসে আসে: হ্যালো···সুবীর স্পিকিং।

—আমি তমাল কথা বলছি। এতক্ষণে ফিরলি বুঝি? যাই হোক, আমি তমাল বলছি, সে যেখান থেকেই হোক না কেন; আমি বেঁচে আছি। একটা বিশেষ ব্যাপারে কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, কালই স্টার্ট করছি। আর সব পরে জানাবো। জ্যাঠাবাবুকে আর ছোটমাকে বলিস।

হঠাৎ লাইন কেটে দেওয়াতে মিতা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিশ্চয় অপরপক্ষ আরো কিছু বলতে চেয়েছিল, তমাল সে সুযোগ তাকে দেয়নি। তার কাছেও নিজের পরিচয় গোপন করে।

—তাহলে সত্যিই তুমি বিলেত যাচ্ছো? তমালের দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করে মিতা।

—কেন, সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

—না, বলছিলাম আমার খুব ইচ্ছে একবার সাগরপারে যাবার।

—হুঁ, তাহলে প্রতিশোধটা কড়ায়-গণ্ডায় তুলতে পারো।

—প্রতিশোধ?

—তা নয়ত কি?

—সত্যিই তোমার মত কঠিন পুরুষ আমি আর দেখিনি। যাই হোক, পৌঁছেই একবার খবর দিও।

এতদিন মিতার মনের কথাটা ভাষায় প্রকাশ পায়। তমাল মনে-মনে খুশীই হয়।

—হ্যাঁ, সরকার মশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি নিশ্চয় দেব।

—আমাকে ধন্যবাদ জানাবে না?

—তোমাকে জানাব জাহাজ ছাড়বার সময় শেষবার। তোমার কাছে আমার ধন্যবাদের মূল্য কতটুকু? তাছাড়া বাংলাদেশে আমিই ও আর একমাত্র পুরুষ নই।

মিতার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। মনে-মনে বলে, না না, আমার জীবনে তুমিই প্রথম ও একমাত্র পুরুষ। আর যারা এসেছিল তাদের আমি খেলার সামগ্রী মনে করতাম, ঘৃণা করতাম। তবুও তোমার কাছে আমি মাথা নত করব না।

—বেশ, দিও না। তাই বলে দুঃখ পাবো না আমি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিতা।

—দুঃখ ? দুঃখ ত তারাই পায়, যাদের হৃদয় ব'লে কিছু আছে।

—তাহলে তুমি কি বলতে চাও—আই অ্যাম হার্টলেস ?

—না, একেবারে লেস্ বলতে চাই না, কারণ মেডিকেল এগজামিন করলে অবশ্য হার্ট বস্তুটা তোমার দেহে পাওয়া যাবে। তবে রূপ যৌবন অর্থ—এগুলো নিশ্চয় প্রয়োজনের চেয়েও তোমার বেশী আছে।

—বেশ, আমার যা আছে তা আমারই থাক, এখন আজকের রাতটা একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়। আজ তুমি এ ঘরে শোবে।

—আবার কেন আমাকে বিরক্ত করছ ?

—তা হোক, তোমাকে যা বলছি তাই কর। জানি না আজকের রাত আমাদের জীবনের অন্তিম-রাত কিনা। সমস্যা ত মিটিয়ে দিয়েছ, তবু এটা আমার অনুরোধ।

দাবীর সমস্যা আমি মিটিয়ে দিইনি, তুমিই মিটিয়ে নিয়েছ টু হু পাই।

—Mita, you have finished your game, so strike up the tent and turn your wheel, and smile again.

আমার নিরুপায় এবং অসহায় অবস্থাই আমাকে কঠিন হতে বাধ্য করেছে। আজ তোমার অনেক কিছুই চোখে পড়বে না কিন্তু একদিন যখন বুঝতে পারবে তখন হয়ত তোমার কাছে সান্ত্বনার কিছু থাকবে না। যাই হোক, আজকের রাত্রের মত তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো, আমি এখানেই থাকছি।

আজ প্রথম মিতার ঘরে জামা খুলল তমাল। তারপর আর দ্বিরুক্তি না করে অত্যন্ত সহজভাবে মিতার বিছানার উপর শুয়ে পড়ল।

কাঠের পুতুলের মত চুপ করে বসে মিতা তাকিয়ে রইল তমালের দিকে।

তমালের কথাগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মিতা মনে-মনে ভেবে দেখে, তমালের দোষ কিছু নয়। সে ত বিপদে পড়ে তারই ইশারায় সবকিছু মুখ বুজে করে চলেছে। এতটুকু প্রতিবাদ করেনি। এ জন্য তো সে-ই সম্পূর্ণ দায়ী।

তমাল যদি সত্যিই চোর বা ভিখারী হত তাহলে হয়ত মাথা নীচু করে সব সহ্য করত। কিন্তু আজ ওর পৌরুষকে ত অবজ্ঞা করতে পারছে না মিতা। ওর নিজের গুণে মিতাকে ক্রমশঃ আকর্ষণ করছে। আর মিতাও অনেকখানি তার কাছে এগিয়ে এসেছে।

কাল থেকে আর ওকে তমাল বিরক্ত করবে না।

জীবনে আর কখনো সে ফিরে আসবে না। তার দিক থেকে সে কোন ত্রুটিই করেনি।

কিন্তু মিতা?

মিতা আবার সেই একা। এ পৃথিবীতে তার আপন বলতে ত আর কেউ রইল না।

তাহলে তমালকে কি মিতার জীবনে প্রয়োজন আছে? হয়ত আছে। কিন্তু ওকে পাবার ত কোন রাস্তা আর খোলা নেই। কোন উপায় নেই তাকে আটকে রাখার।

এতক্ষণে তমাল ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ হয়ত ও শেষ সুযোগ দিয়েছে মিতাকে। কিন্তু সে সুযোগ কি গ্রহণ করবে মিতা? তবে কি ঐ ঘুমন্ত নির্দোষ মানুষটার পায়ের উপর আছড়ে পড়বে? বলবে, ওগো! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তোমাকে না পেলে আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে।

তাই বা কি ক'রে সম্ভব? ওর হবে জিৎ আর আমার হবে চরম পরাজয়? হোক, তাতেই বা ক্ষতি কি? নারীর জীবনে স্বামী ত পর নয়। তার কাছে মাথা নত করতে দোষের কি থাকতে পারে?

তমাল সুপুরুষ, সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র এবং একমাত্র অর্থ ছাড়া ওর জীবনে নিঃসন্দেহে আর সবকিছু আছে।

তার স্বামী হবার সব গুণই আছে।

তবে তাকে কেন সে স্বীকার করতে পারছে না? সেটা কি মিতার দম্ভ? না, সেইদিনকার ভোর রাত্রের সেই দুর্ঘটনা? হয়ত তাই। অর্থের মোহে অন্ধ ছিল সেদিন। তাই অমন ক'রে তার মাথাটা জোর ক'রে নুইয়ে দিয়েছিল। সেদিন তমালের দুর্বলতার আড়ালে আসল মানুষটিকে চিনতে পারেনি, কিন্তু যেন ঠিক তমালের মতই একটি পুরুষকে তার প্রয়োজন হয়েছে। এতদিনে তার স্থূল দিকটাই দেখেছে, আজ তার সূক্ষ্ম দিকটা ধরা পড়েছে।

অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে মিতা। আজ তমালকে ফিরে পাওয়ার রাস্তা সে নিজেই বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

জানালার কাছে এসে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। স্নেহ-ভালবাসা ছাড়া কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। জন্ম-নিঃস্ব সে; পৃথিবীর আলোক দেখার সঙ্গে-সঙ্গে হারিয়েছে তার মাকে। তারই শৃঙ্খলহীন উদ্ধত ইচ্ছার আঘাতে হারিয়েছে তার বাবাকে। ঈশ্বরের করুণায় হঠাৎ যে অমূল্য সম্পদ সে কুড়িয়ে পেয়েছিল তাকে সে ধরে রাখতে পারল না। নিজের নির্বুদ্ধিতায় হারিয়ে ফেলতে হল তাকেও চিরদিনের জন্য।

ফিরে এসে তমালের মাথার কাছে বসে মিতা।

তমাল নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মিতা ভাবতে থাকে কত-কি।

পরদিন সাতটায় তমালের ঘুম ভাঙল। মিতা লম্বা সোফাটায় তখনো ঘুমুচ্ছে। মিতার বাঁ-হাতখানা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে।

কাল রাত্রে ওর বিছানায় শুয়ে হয়ত অন্যায় করেছে। নিজেকে অপরাধী ব'লে মনে হল। অনেকক্ষণ আগু-পিছু ভেবে একটা বালিশ নিয়ে মিতার মাথার নীচে দিয়ে হাতখানা তুলে দিয়ে বাইরের ইজি-চেয়ারটায় এসে বসে।

কিছুক্ষণ পর নন্দর মা চা নিয়ে আসে।

—দিদিমণি বুঝি এখনো ওঠেনি ? প্রশ্ন করে নন্দর মা।

—না, এখনই উঠে পড়বে।

—আজ নাকি আপনি বিলেতে যাবেন দাদাবাবু ?

— হ্যাঁ নন্দর মা, আজই যাবো। কবে ফিরবো তার কোন ঠিক নেই, তোমার দিদিমণির দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। ও বড় একলা আর বড় অবুঝ।

—আপনার কথা মনে থাকবে দাদাবাবু। মাথা নীচু করে বলল নন্দর মা,—আপনজন বলতে আর কেউ রইল না। আমাদের ক্ষেমতাই বা কতটুকু।

নন্দর মা চলে যায়।

তমাল দু'কাপ চা তৈরী ক'রে মিতার কাছে গিয়ে ওকে ডাক দেয়। মিতা উঠে বসেই মাথার নীচে বালিশ দেখে বুঝতে পারে যে, গত রাত্রে চিন্তা করতে-করতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। তমালই ওর মাথার নীচে বালিশ দিয়ে গেছে, তবু ডাকেনি।

—চা কতক্ষণ এসেছে ? ধীরে ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে মিতা।

—এই ত কিছুক্ষণ হ'ল। আমি বারান্দায় বসেছিলাম, নন্দর মা দিয়ে গেল।

—কতক্ষণ উঠেছ ?

—তা প্রায় এক ঘণ্টা। তুমি ঘুমুচ্ছিলে বলে ডাকিনি।

—হুঁ, আজ ত আর কোন কাজ নেই।

—না, সবই ত রেডি।

—শুধু মনটাকে রেডি করতে যা সময় লাগছে, নয় কি ?

—না না, মন আমার রেডি-ই আছে। আমার কথা বাদ দাও না, আমার মন-টন নেই।

—বেশ। যাই বাথরুম থেকে আসি, আজ খাবার মেনুটা বলে দিতে হবে। মিতা উঠে দাঁড়ায়।

—নিশ্চয়, নইলে ফেয়ারওয়েলটা ভালো দেখায় না।

তমালও উঠে দাঁড়ায়। মিতা একবার আড়-নজরে তমালের দিকে চটুল চাহনি হেনে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তার চলার ছন্দে ফুটে ওঠে সলজ্জ কামনার চঞ্চলতা।

ট্রেনের টিকেটের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। মিতার পছন্দমত বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছে। সুবীর তার গাড়িতেই সকলকে হাওড়া নিয়ে এলো। নন্দর মা আর সরকার মশাই যাবেন বোম্বাই অবধি। সেখান থেকে তমালের জাহাজ ছেড়ে গেলে ওরা ফিরে আসবে কলকাতায়। ওদের জন্য অবশ্য অন্য কামরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ট্রেন আসতে এখনো খানিকক্ষণ দেরী আছে। যতক্ষণ সময় পাওয়া যায় সুবীর তার সদ্ব্যবহার করবেই। সুযোগ মত কথা কথায় তমালকে একটু আড়ালে এনে প্রশ্ন করে সুবীর,—কি ব্যাপার, একটু খুলে বলবি ?

—সময় এলে সব বলব 'সু'। এখন তোর কাছে শুধু একটা রহস্য বলে মনে হবে, কিন্তু এটাকে শুধু রহস্য বললে এর অনেকটা বাদ পড়ে যাবে। একে একটা অযাচিত সাংঘাতিক দুর্ঘটনা বলতে পারিস্। আমি ভাবতে পারিনি ···

তমাল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ওর ভাষা যেন কেউ হঠাৎ কেড়ে নিয়েছে। সুবীরও আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না।

—আমি জানি তমাল, দেয়ার ইজ সামথিং রং, বাট্, বাট · কি আর বলব বল। তুই যেদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলি সেইদিন আমি বুঝেছিলাম তুই আমার কতখানি। তাছাড়া সবচেয়ে আঘাত পেলেন মা। অত্যন্ত কাতর হয়ে মা বলছিলেন, তমাল প্রমাণ ক'রে গেল যে ও আমার পেটের সন্তান নয়। যাই হোক, আমার জীবনের ভবস

কতটুকু, তুই কথা দিয়ে যা ফিরে এসে তোর ছোট মায়ের কাছে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটাবি?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সে-কথা না বললেও চলবে। যাক, যাবার সময় আর মনটাকে ভেঙে দিস্ না। আমি গিয়ে তোকে সব জানাবো, তুই ত বলিস Life is a cigarette which begins in fire and ends in smoke. এবার মনে কর, আমিও একটা চাল চাললাম হার-জিৎ পরের কথা। চল ভিতরে গিয়ে বসি, এখনও মিনিট পাঁচেক সময় আছে।

মিতা ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরা আসতে হাসিমুখে বলল,—বাবা, কথা আর ফুরোয় না!

—একথা কি ফুরোবার বৌদি? এই দু'মাসের জমানো কথা আশী বছরেও শেষ হবে না। তারপর ওর কথা শুনতে সময় লাগবে।

—তা যা বলেছেন। ওর কথা ত কথা নয়, যেন হাজার বছরের জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি, শুনলে জ্বলে যায় সর্বাঙ্গ। যাই বলুন, আপনার বন্ধুটির হৃদয় ব'লে কিছু আছে ব'লে আমি প্রমাণ পাইনি। ওর সবটুকুই যেন এক লৌহধাতুতে গড়া।

তমাল বলে ওঠে,—তুমি তাহলে প্রস্তরীভূত শিলা।

তিনজন একসঙ্গে হেসে ওঠে।

—কিন্তু তোর বৌদি স্টক রাখে না, বুঝলি 'সু'। ও রোজই স্টক ক্লিয়ার ক'রে দেয়।

সুবীর লক্ষ্য করে, মিতা একথার জবাব দিতে পারে না। হঠাৎ ওর মুখটা পাংশুবর্ণ ধারণ করে।

—কি বৌদি! মুখ টিপে হাসে সুবীর।

—না ভাই, আমি হার মানছি।

—ব্যস, হিয়ার ইউ আর। এতদিন পরে আজ স্বীকার করেছে।

—না ভাই। সুবীর বলে,—বাংলার নারী হার মেনেই সুখী! এমনি ক'রে দল ভারী ক'রে ওকে হারাবার কোন মানে হয় না।

—ঠিক বলেছেন মিঃ চৌধুরী। দেখুন না এমনি ক'রে রোজ আমাকে হার মানায়।

—আপনি কিন্তু খুব সেন্টিমেণ্টাল।

এবার তমাল হো-হো ক'রে হেসে ওঠে।

—ঠিক বলেছিস্। সেন্টিমেণ্টাল বলে সেন্টিমেণ্টাল! একেবারে সেন্টিমেণ্টফুল।

সময় হ'ল। ঘণ্টা পড়তে সুবীর উঠে দাঁড়ায়। মিতাও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দরজার কাছ অবধি এসে দাঁড়ায়।

—আচ্ছা বৌদি, সময় হয়েছে, এবার আমার যাবার পালা নমস্কার!

—নমস্কার, আমার বাড়ি চেনা রইল, আমি বোম্বাই থেকে ফিরলে নিশ্চয় আসবেন।

—সে আর বলে দিতে হবে না। তখন আবার তাড়াতে পারলে বাঁচবেন। আচ্ছা তমাল, চললাম, তুই চিঠি দিতে ভুলিস্ না যেন

—আয় ভাই, ছোটমাকে প্রণাম দিস্, আমি গিয়েই চিঠি দেব উত্তর দিস্।

ট্রেন ছেড়ে দেয়। ধীরে-ধীরে প্লাটফরম থেকে এগিয়ে যেতে থাকে। তমাল আর মিতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকে। আর প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সুবীর রুমাল নাড়িয়ে বিদায় নেয়

কারো খেয়াল নেই যে এখন কাউকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তবু দাঁড়িয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে। সকলেরই চোখের কোণে জমে রয়েছে দু-এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু।

তারপর এক সময় চমক ভাঙতে যে যার জায়গায় ফিরে আসে, কয়েকটি মুহূর্ত আগের স্মৃতিটুকু নিয়ে।

তমাল বিলেত চলে গেছে।

হয়ত চিরদিনের মতই চলে গেছে। রেখে গেল এই ক'টা দিনের সুখে-দুঃখে মেশানো স্মৃতিটুকু।

তমাল আজ নাগালের বাইরে। ধূমকেতুর মত এসেছিল মিতার জীবনে, অকস্মাৎ আবার মিলিয়ে গেল ঠিক তেমনি ক'রে আপনা-আপনি।

তমাল আজ নেই মিতার জীবনে।

আছে শুধু তার পবিচয়টুকু। হেম লজের অণু-পরমাণুতে যেন তমাল মিশে আছে। মিতার রোমে-রোমে আজ তমাল আঁকা হয়ে রয়েছে।

দিন-দশেক পরেই মিতা কোলকাতায় ফিরে এলো। বাড়ি ফিরতেই ও যেন একটা কিছুর অভাব বোধ করতে লাগল।

প্রতিহত জীবনের দারুণ নিঃসঙ্গতার আলিঙ্গনের নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে ওঠে। আজ সে প্রথম অনুভব করল এত বড় পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা।

শোবার ঘরের টেবিলের উপরকার তমালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে অপলকদৃষ্টিতে। স্মরণের স্বরলিপি গাইতে থাকে জাহাজ ছাড়বার পূর্বক্ষণে তমালের শেষ মেঘমন্দ্র স্বর :

'ভাগ্য যখন বিচ্ছেদই এনে দিয়েছে তখন আর ফিরে চেয়ো না পিছনে! যা হারিয়ে গেল তাকে ভুলে থেকো। যদি কখনো চলার পথে মুখোমুখি দেখা হয়, তখন অপরিচিতার দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলবে তোমার চোখে। আমাদের অদৃষ্টের নির্মম আঘাত আমাদের দু'জনকে নিয়ে চলেছে চির-রহস্যাবৃত নিয়তির ইঙ্গিতে জীবনের আর এক

পথে। জানি না সে পথ কণ্টকপূর্ণ না কুসুমাকীর্ণ। ঈশ্বর যেন আমাদের দু'জনকেই সেই পথে চলতে শক্তি দেন।'

প্রথম দু-তিনদিন বাড়ি থেকে কোথাও বেরুল না। ইতিমধ্যে অবশ্য দু-একজন বন্ধু-বান্ধব এসেছিল, কিন্তু শরীর খারাপের অজুহাতে তাদের সকলকে বিদায় দিয়েছে।

এমন কি, নন্দর মাও বড় একটা কাছে আসে না।

তমালের জাহাজ ছাড়বার পর দিন-দশেক মিত্রা বোম্বাইটা ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর যখন কলকাতার ট্রেনে চাপল তখন মনে হয়েছিল আপদ গেল।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে যেন আপদ বাড়ল।

প্রতি মুহূর্তে তার কথা মনে পড়ে কেন?

আবার ভাবে, যাকগে। এক জায়গায় কিছুদিন থাকলে অমন হয়। কনভেন্টে থাকাকালে জনি, অরুণ, পলি, সীমা, মিসেস বার্গেণ্ডি ওদের সকলের কথাও ত মনে পড়ে প্রায়ই। তমালকেও তেমনি দু-চারদিন মনে পড়বে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

মোট কথা, জিদ ত বজায় রইল। তারপর রইল রাশি-রাশি টাকা, অফুরন্ত রূপ-যৌবন, বাড়ি-গাড়ি সব—সবকিছু। তাহলেই পৃথিবীর সবকিছু যেন তার অধিকারে।

এত সবকিছুর ভীড়ে একটা ছোট্ট দুর্ঘটনার মত তমাল কোথায় তলিয়ে যাবে, কেউ জানবে না তার খোঁজ।

কোথাকার কে তমাল সেন? কি তার পরিচয়? কোথায় তার ঠিকানা? কি দরকার অত সবে!

এক ঝলক বিদ্যুতের মত এসেছিল আবার মিলিয়ে গেল সীমাহীন নীল আকাশের বুকে।

এখন? আই হ্যাভ মানি অ্যাণ্ড মাই ফ্রেণ্ডস্।

তমালকে খুব ঠকিয়েছি যাই হোক। বরাত ভালো, লোকটা

বেঁকে বসেনি। চমৎকার অভিনয় করে গেল। কেনই বা করবে না? আর কিছু না হোক, লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছে।

কিন্তু···

কিন্তু কোথায় যেন একটা খট্‌কা রয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে অর্থাৎ তার প্রয়োজনের ঠিক আগের রাত্রে হঠাৎ উল্কার মত চোরের বেশে তমালের আবির্ভাবের রহস্যটা রহস্যই রয়ে গেল। ওর বন্ধু সুবীর চৌধুরীর কথায় অবশ্য খানিকটা জানা গেল, তমাল পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু কেন পালালো?

নিশ্চয় কোন গভীর রহস্য রয়েছে এর পিছনে।

এক-এক সময় মিতার মনে তমালের জন্য খানিকটা শ্রদ্ধার উদয় হয়। কী অদ্ভুত পুরুষ! আশ্চর্য চরিত্র! এমন পুরুষ মিতা জীবনে একটিও দেখেনি। একটা দিনের জন্যেও তার চোখে দেখা যায়নি অন্য দৃষ্টি। কতবার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু দাবী করেনি।

যদি দাবী করত?

আইনতঃ তার অধিকার ছিল। তাহলে নিশ্চয় মিতা তাকে অস্বীকার করতে পারত না। সর্বনাশের বাকি থাকত না তাহলে।

এমনি সব নানা চিন্তায় কাটলো কয়েকটা দিন।

সেদিন বিকেলে ক্লাবে এলো প্রায় চার মাস পর। অভ্যর্থনার ত্রুটি হল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ল পুরনো প্রার্থীর দল। অনেকদিন পর সোসাইটি যেন হারানো মানিক ফিরে পেয়েছে।

একে একে হাত বাড়ালো সকলে। জানালো অভিনন্দন। দীর্ঘজীবন কামনা করে সকলে ওদের অর্থাৎ মিতা আর মিতার স্বামীর। সকলে তাকিয়ে দেখল মিতার মাথার ক্ষীণ সিঁথির রক্তরাঙা রেখাটিকে। অবাক হয়ে তারা যেন অষ্টম আশ্চর্য দেখছে। মিতার মধ্যে আগের মত নেই সেই নদীর কল-কল উচ্ছ্বাস। এখন সে ধীর স্থির শান্ত, যেন বিনীত শালীনতার প্রতিমূর্তি।

কিন্তু আজ এদের সকলের ব্যবহারে যেন একটা মার্জিত-ভাব, যেন একটু আলাদা করে ভাবছে সবাই।

মিতার বুঝতে কষ্ট হয় না সকলের আচারে-ব্যবহারে এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হ'ল বাহ্যিক জগতে ওর বিবাহিতা বলে পরিচয়।

বেপরোয়া হয়ে মিতা এগিয়ে যায় মিহির গুপ্তের কাছে। অবাক হয় মিহির গুপ্ত, বার. এ্যাট. ল.। এমন অদ্ভুত সুন্দর মিতাকে এর আগে আর কখনো মনে হয়নি। আজ ওর রূপসজ্জা দেখলে স্বর্গের অপ্সরাও বোধ হয় লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেত।

—হ্যালো ··মিতা দেবী, কনগ্রাচুলেশন! আসুন। তা একা? মিস্টার কোথায়?

—হ্যাঁ, একাই মিঃ গুপ্ত। তিনি বিলেত গেছেন।

··মানে? এমন রাজকন্যাকে ছেড়ে রাজপুত্র কি সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আর এক রাজকন্যার সন্ধানে গেলেন?

—হয়ত তাই। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বলে মিতা,—কথা ছিল বিয়ের পরই বিলেত ঘুরে আসবে।

—কেমন আছেন বলুন।

—বেশ ত দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। আসুন একটু কফি খাওয়া যাক। সামনের চেয়ারটা দখল করে মিতা।

—উঃ, আপনাদের ছেড়ে পুরো চারটে মাস যে কি ক'রে কাটল তা ভাবতেও পারছি না।

—হাউ ওয়াণ্ডার! চমৎকার কেটেছে বলুন। মানুষের জীবনে সবচেয়ে মধুময় দিন হ'ল বিয়ের পরের ক'টা দিন। বোম্বেতে হানিমুনটা এত তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে এলেন, সেইটাই ত আশ্চর্য লাগছে।

—আশ্চর্যের কি আছে? তাড়াতাড়ি শেষ না হলে নতুনের স্বাদ যে পুরনো হয়ে যাবে। যাই হোক, চলুন আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে মিঃ গুপ্ত হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন,—এক্স্কিউজ মি, মিতা দেবী। আজ আমাকে এখনই একবার বেরুতে হবে। একটা জরুরী এনগেজমেণ্ট আছে।

—আজ না গেলেই নয়? মিতা চেষ্টা করে প্রাক্-বিবাহকালে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

—সরি, আমাকে যেতেই হবে।

মিঃ গুপ্ত উঠে দাঁড়ায়।

অত্যন্ত আহত হয় মিতা মিঃ গুপ্তের প্রত্যাখ্যানে।

ধীরে ধীরে চিন্তাধারার পরিবর্তন হতে লাগল। ইতিমধ্যে সোসাইটির অনেককে সঙ্গে নিয়ে সে নিভৃতে এসে তাদের মন বুঝতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই মিতার দেহটাকে ভোগ করতে চায়। সাহচর্য চায় অনেকে, কিন্তু মূল্যের বিনিময়ে।

মিতা তাই ধীরে ধীরে সরে এসেছে নীরবে সকলের কাছ থেকে।

আজ বার-বার তমালের কথা মনে পড়ে। আজ তমালের গুরুত্ব বুঝতে পারছে মনে-প্রাণে। যতবার জোর ক'রে তমালকে মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছে ততবারই যেন মন বলছে, তমাল চিরকাল তোমার মধ্যেই বেঁচে থাকবে।

সত্যিই তমাল তাকে দেউলে ক'রে দিয়ে গেছে। বার-বার তাই আজ যেন তমালের প্রয়োজন অনুভব করছে। মাত্র কয়েকটা দিন এসে ওর জীবনটাকে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়ে গেল। আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ যা পারেনি, তমাল তাই পেরেছে।

আজ মিতার মনে পড়ে সে কি যন্ত্রণা দিয়েছে তমালকে। কি অবিচার করেছে তার উপর। কিন্তু সে নীরবে সহ্য ক'রে গেছে সবকিছু। একবার একটু প্রতিবাদও করেনি, আঘাত পাবার জন্যই যেন নিজেকে এগিয়ে দিয়েছে বার-বার।

সেদিন যাকে চোর ব'লে ঘৃণা করেছিল, যাকে ভেবেছিল তার স্বার্থরক্ষার উপকরণ মাত্র, আজ ত তাকে তেমন ভাবতে মন চাইছে না। এখনো যেন এই ঘরটার মধ্যে তমালের সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর গুমরে-গুমরে বেড়ায়ঃ 'আমি চোর নই, পরিবেশ আমাকে চোর আখ্যা দিয়েছে তা আমি স্বীকার করছি।'

তবে কেমন ক'রে এমন অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল? কেন সে অমনভাবে তার ঘরে এসে ঢুকেছিল? কেনই বা পাড়ার লোক তাকে তাড়া ক'রে এসেছিল?

হয়ত তার পিছনে ছিল কোন গোপন রহস্য, দুঃখজনক কাহিনী—যা প্রকাশ করবার সুযোগ তাকে দেওয়া হয়নি। মিতা কখনো জানতে চায়নি কি তার পরিচয়, কেন সে এসেছিল নিশুতি রাতের অন্ধকারে তার ঘরে অমন বেশে?

আজ এই লক্ষ-লক্ষ টাকা, এই অগাধ সম্পত্তি শুধু তারই বদান্যতায় রক্ষা পেল। নিষ্কণ্টকভাবে বেঁচে থাকার আর কোন উপায় ছিল না মিতার, যদি না দুর্ঘটনার মত তমালকে পেত। তমাল না হলে নিশ্চয় তাকে কোন পুরুষের সাহায্য নিতে হত। তার কাছে মাথা নত করতেই হত। হয়ত তার দাবীর কাছে বিলিয়ে দিতে হত নিজেকে জিদ বজায় রাখতে। কিন্তু তমাল? সে ত নির্বিচারে সব সয়ে গেছে।

হয়ত তমাল বুঝতে পেরেছিল একাজ কত ভয়ানক। তাই বোধহয় সে বলেছিল, 'এ প্রস্তাবের চেয়ে আমাকে গুলী করুন, আমি চোর, রাস্তা আমার ঠিকানা, ক্ষিদে আমার সাথী!'

সেদিন উত্তেজনার বশে মিতা তার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। তার কথার মধ্যে লুকানো ছিল যে অব্যক্ত বেদনা, আজ সে-কথা ভাবতেও মিতার চোখ দুটো ছল-ছল করে ওঠে। মানুষের বা সমাজের এ রূপটা এতদিন অজানা ছিল।

যে রিক্ত পুরুষ নিঃশব্দে এলো আর চলে গেল, সে যে কত

মহৎ তা আজ বার-বার করে মনে পড়ছে মিতার। তাই তার স্মৃতি বৃশ্চিক দংশনের মত জ্বালা দেয় মনে।

মিতা এবার অনুভব করছে যে তমালের শৌর্যের কাছে সে কত অসহায়, কত তুচ্ছ। তমাল শুধু জয়লাভই করেনি, মিতার সমস্ত জীবনটা বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে গেছে।

পুরুষকে আজ অন্য নজরে দেখল মিতা।

পুরুষকে নিয়ে সে এতদিন খেলা ক'রে এসেছে। অনেক পুরুষের সান্নিধ্যলাভ করেছে, কিন্তু তমাল তাদের সবাইকার ব্যতিক্রম। তমাল তাকে ভালবেসেছিল, তমাল তাকে চেয়েছিল অন্তর দিয়ে। কিন্তু স্বার্থান্ধ মিতা তাকে ঠকিয়েছে, বঞ্চিত করেছে তার দাবী থেকে। তাই বুঝি আজ তমালের নীরব অভিশাপ তাকে অনুতাপের আগুনে ধিকি-ধিকি জ্বালিয়ে মারছে।

কে জানে কতদিন এমনি ক'রে জ্বলতে হবে।

কিন্তু এখন কি তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না? হয়ত যায়, তাহলে তাকেও যেতে হবে বিলেতে।

না না, তা হয় না। তার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে তাহলে।

শিক্ষা-শেষে তমাল নিশ্চয় ভারতবর্ষে ফিরে আসবে। তখন মিতা যাবে তার কাছে উপযাচিকা হয়ে। ওর মাথা নত ক'রে দেবে তার পায়ের কাছে, ক্ষমা চাইবে। তখন নিশ্চয় তমাল তাকে ফিরিয়ে দেবে না, অস্বীকার করবে না।

কিন্তু ততদিন হয়ত এমনি চিন্তা ক'রে ক'রে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলবে। তখন যদি তমাল ব্যঙ্গ করে? তাহলে এতদিন সে থাকবে কি নিয়ে?

—তুমি অমন ক'রে সারা দিনরাত কি ভাবো দিদিমণি?

ওর চিন্তার উৎস কোথায় নন্দর মা তা জানে। সেও ত নারী। তারও ত স্বামী ছিল। মনে পড়তে নন্দর মায়ের বুকটা টন-টন ক'রে ওঠে।

—কি করি বলত নন্দন মা, সময় যে কাটতে চাইছে না।

—কি বলব দিদিমণি, আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, অত-শত বুঝি না। আজকাল মেয়েরা কত বয়েস পর্যন্ত লেখাপড়া করে। যদি তাও করতে তোমার সময়টা কাটত। আয়নার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ ত এই ক'দিনে চেহারাটার কি অবস্থা হয়েছে।

নন্দর মা এতদিন কাজ করছে, কিন্তু এমন সামনে বসে-বসে কথা বলবার সাহস হয়নি কখনো। তার প্রধান কারণ, এতদিন দিদিমণির যা মেজাজ ছিল তাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে কথার জবাব দেওয়া একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। সাহস ক'রে অনেকে কাছেই আসে না।

অথচ এই ক'দিনে মিতা যেন একেবারে বদলে গেছে।

একমাত্র চাকর-বাকর নিয়েই ত হেম লজের পরিবার জম-জম করছে। মিতা এখন ওদের চলাফেরা কথাবার্তা লক্ষ্য করে, ওদের সম্বন্ধে চিন্তা করে। ওর এখন এসব ভাবতেও ভালো লাগে।

নন্দর মার কথায় মিতা যেন চিন্তার একটা সূত্র খুঁজে পায়; আনন্দে ওর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—কি ভাবছ দিদিমণি ? ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করে নন্দর মা।

—ভাবছি, তুই খুব দামী কথা বলেছিস্, অথচ কথাটা কাজে লাগানো যায় কি ক'রে।

হঠাৎ চাঁপার কথা মনে পড়ে মিতার। সে সন্ধান পেয়েছিল মাতৃত্বের। আজ সে ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে।

—কি যে বলো, দামী কথা আমরা কোথায় শিখবো বলো। তবে দেখেছি, বাবুদের বাড়ির মেয়ে-বৌয়েরা বিয়ের পরেও লেখাপড়া করে, ছবির কলেজে পড়ে, গান শেখে, নাচ শেখে, উকিল-ব্যারিস্টার হয়, তাই বললাম।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে মিতার বাদামী চোখের তারা। শিউরে ওঠে সমস্ত শরীরটা। সঙ্কল্পে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে ওঠে চোখে-মুখে, —ঠিক বলেছিস্, আমি আইন পড়ব। তোর দাদাবাবু বিলেত থেকে

ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে দেখবেন, আমিও বসে নেই. আইন পাশ ক'রে তাঁর পাশে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা অর্জন করেছি। খুব মজা হবে, না রে নন্দর মা?

নন্দর মায়ের আনন্দের সীমা থাকে না। হঠাৎ লটারীর প্রথম পুরস্কার পাবার চেয়েও যেন এ আনন্দ বেশি। তার মত একটা সাধারণ ঝি-এর কথায় রাজী হয়ে যাবে মিতার মত দাম্ভিক ধনী গৃহস্বামিনী, এ যে কত বড় জয় তা ভাবতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয় নন্দর মায়ের। আর কিছু না ব'লে দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বলল নন্দর মা,—জয় মা কালী! আমার পাঁচ সিকের ভোগ মানত্ রইল কালীঘাটে। পড়লে তুমি নিশ্চয় পাশ করবে।

—ঠিক আছে, তোর সাথে আমারও পাঁচ সিকের পূজো দিস্।

আনন্দে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে নন্দর মা মিতার হাত দু'খানা ধরে নিজের মাথায় চেপে ধরে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু দিদিমণি, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে। সাহস দাও তো বলি।

—বল্ না হতচ্ছাড়ী।

—বলছিলাম, দাদাবাবুর আসতে কত দেরী হবে?

—তা বছর চারেক ত নিশ্চয়।

—ও মাগো! বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে নন্দর মা বলল,—এতদিন?

মুখে যা বলতে পারেনি আজ তাই কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসল। পরিষ্কার ক'রে জানাবে তমালকে। কিন্তু কি লিখবে? চোখ দুটো যেন ঝাপ্সা হয়ে আসে।

'তুমি এত নিষ্ঠুর যে একটা সংবাদও দিলে না? একটি বারও কি মনে পড়ে না আমার কথা? আমি জানি আমার অপরাধের গুরুত্ব কতখানি। কিন্তু তোমাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে আমার

কাছে তুমি ক্ষমার প্রতিমূর্তি। তুমি কি পারো না আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আমাকে আপন ক'রে নিতে? নিশ্চয় পারো। তুমি কি মনে করেছ যে একটা কাগজে সই ক'রে দিয়ে এত বড় দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে গেছ? না না, তোমার মন এত ঠুন্‌কো নয়। যে অন্যায় আমি করেছি তা ক্ষমা ক'রে ফিরে এসো তুমি, আমায় আত্মশুদ্ধির সুযোগ দাও।

একদিন তুমি তোমার সবকিছুর বিনিময়ে আমার মর্যাদাকে, আমার ভবিষ্যৎকে রক্ষা করেছিলে, কিন্তু আজ তোমারই অভাবে যে সবকিছু নষ্ট হতে চলেছে।

আজ আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি তমাল! তোমার গভীর অনুভূতি আমাকে দোলা দিচ্ছে। সেদিন তা প্রকাশ করতে পারিনি, আমার বহ্নিদীপ্ত উন্মাদনা শান্ত হয়েছিল তোমাকে পাওয়ার এক তীব্র মুহূর্তে। বিশ্বাস করো, আমার ভুল বুঝতে পেরে আমি নিজের পরিচয়ের অবগুণ্ঠনখানি যখন তুলে ধরেছিলাম তখন অন্ততঃ আমার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। তোমার কাছে আমার প্রেমের নৈবেদ্য নিবেদনের আড়ালে আমি পেয়েছিলাম পরম পরিতৃপ্তি। আমার অতীত জীবন তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, ঘটনার আকস্মিকতা অকস্মাৎ রূপ নিয়েছিল সত্যের কুসুম-স্তবকরূপে আর বিস্ময় ক্রমশঃ সহজ হয়ে আমার কাছে এনে দিয়েছিল অপূর্ব ফুটে ওঠা লাবণ্যের এক আতপ্ত ঔদ্ধত্য। আমার মনঃশিলা ছন্দিত হয়ে উঠেছিল তোমার সুন্দর উদ্দাম প্রাণোচ্ছ্বাসের যাদুস্পর্শে।

বিয়ের রাতে তোমার প্রশান্ত বুকে মাথা রেখে আমার মনে হয়েছিল, আমি সুখী। অতি বেদনায় অতি আনন্দে কি যেন একটা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল আমার মধ্যে। চেষ্টা করেছিলাম তোমাকে বেঁধে রাখবার জন্য। কিন্তু আমার আঘাতেই তুমি সন্ধ্যার আকাশে ক্ষণস্থায়ী তারার মত বিদায় নিলে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে তোমার অধিকার—তোমার দাবী। নিজেকে তুমি আমার মধ্যে

প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেলে চিরজীবনের মত, কিন্তু আমি পারলাম না তোমার মনে এতটুকু রেখাপাত করতে। এ যে আমার বেঁচে থাকবার কলঙ্ক। তোমারই মাঝে যেন শুনতে পেয়েছিলাম,—আছে, আছে প্রেম ধূলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।

কিন্তু তোমার চলে যাবার পর থেকে আমার বেদনার্ত অন্তরে একটা বোবা কান্না বার-বার সবকিছু গোলমাল ক'রে দিচ্ছে। কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছি না সেই দুঃখময় পরিচ্ছেদটাকে। নিজেকে নিজে দেবার কিছুই নেই, সব হারিয়েছি। সারাজীবন কী এমনি ক'রে ভুলের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে আমাকে? তুমি কি পারবে না আমাকে ঘিরে রাখতে? পারবে না ফিরে এসে তোমার ন্যায্য অধিকার বশে আমার উপর চরম প্রতিশোধ নিতে?

ভারতবর্ষে ফিরে সোজা যদি তোমার মিতার কাছে ফিরে না আসো তাহলে আমার মৃত্যুই তোমার ন্যায্য অধিকারের উপর দিয়ে তোমার চলার পথ সুগম ক'রে দেবে।

এত বড় দায়িত্ব আমি একলা সহ্য করতে পারছি না। তুমি ফিরে এসে যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দাও......'

আর লিখতে পারে না মিতা। চোখের দৃষ্টি আরো ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। কলম রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। কি যেন ভাবে।

এমন সময় নন্দর মা ঘরে এসে মিতার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল,—না বাপু, এত তাড়াতাড়ি তুমি তাকে যেতে দিয়ে ভালো করোনি। তেনার ত আর চাকরি করতে হবেই, এমন কথা নয়। তবে অত তাড়া কিসের? অন্ততঃ একটা বছর হাসি-আনন্দে ঘর ক'রে গেলেও চলত। তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? তুমি বাধা দিলে কি তিনি যেতে পারতেন?

—তুই বুঝবি না নন্দর মা। ওরা যে পুরুষ। ওরা সব পারে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিতা। একমুহূর্তে ওরা ভুলে যায় চাকর-মালিক

সম্বন্ধ। যেন কতকালের বান্ধবী দু'জন,—এতদিন যে কথা বুঝতে চাইনি ইচ্ছে ক'রে আজ তা অনুভব করছি মনে-প্রাণে। হাজার হলেও আমরা নারী। নাঃ, তুই কিছু বুঝিস্ না।

—বুঝি বৈকি দিদিমণি, জানিও কিছু-কিছু।

—তবে এখন যা আমার সামনে থেকে। আমাকে একলা ভাবতে দে।

নন্দর মা বুঝতে পারে এর পর আর কোন কথা চলবে না। এতক্ষণ কোন অপদেবতা মাথায় এসে ভর করেছিল, তাই এমন ভালোমানুষের মত কথা বলে গেল।

আবার মিতার দৃষ্টি পড়ে টেবিলের উপর রাখা ফটোস্ট্যাণ্ডটার দিকে। বিয়ের রাতে তমালের সঙ্গে তুলেছিল। তমালের বুকের উপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে মিতা। মিতার একটা হাত তমালের হাতে। যেন মিতাকে আদর করছে তমাল। হারিয়ে যাবার ভয়ে যেন চেপে ধরেছে বুকের মধ্যে। ছবিটার দিকে তাকালেই সেদিনকার দৃশ্যটা স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সে স্পর্শ জীবনে কখনো ভুলতে পারবে না মিতা। চোখ বন্ধ করলে এখনো যেন তমালের বুকের স্পন্দন শোনা যায়। সেই শব্দের ছন্দে-লয়ে যেন লুকানো রয়েছে মিতার ভবিষ্যৎ।

॥ আট ॥

এর পর মিতার পক্ষে একা বাড়িতে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল। কি করি কি করি ভেবে ভাবনার কূল-কিনারা পায় না কিছু। এই সময় চাঁপা থাকলে তার মায়ের স্থান পূরণ করত। সে পথও বন্ধ করেছে নিজে। আজ বুঝতে পারছে এতদিনে অন্ততঃ তার একটা খবর নেওয়া উচিত ছিল।

এমনি ক'রে কয়েকদিন চিন্তা ক'রে মনে-মনে ঠিক করল চাঁপার মত একজন অভিভাবক তার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নইলে এ-বাড়িতে তার থাকা প্রায় অসম্ভব। সংসার-ধর্মের সে বোঝে না কিছু। প্রতি পদে অসুবিধা আর বিরক্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

আর চিন্তা না ক'রে একদিন সোজা গিয়ে উপস্থিত হল বেনারসে চাঁপার কাছে।

সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে চিরস্নেহময়ী চাঁপা।

সদরে মিতাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। মিতাও চাঁপাকে দেখে নিজেকে আর চেপে রাখতে পারে না। কত যুগ পরে আপনার জনকে কাছে পেয়েছে। এগিয়ে আসে চাঁপা মিতার কাছে। মিতা জড়িয়ে ধরে চাঁপাকে, তারপর ভেঙে পড়ে রুদ্ধ কান্নায় চাঁপার বুকে মুখ লুকিয়ে।

—ঘরে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে নেই।

আর কিছু বলতে পারে না চাঁপা। মিতাকে পেয়ে তার মাতৃ-হৃদয় উথলে ওঠে।

ঘরে এসেই চাঁপার দু-হাত ধরে মিতা অবোধ বালিকার মত বলে,—আজই আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে কলকাতায়।

হঠাৎ একথার কি উত্তর দেবে বুঝে পায় না চাঁপা। ওকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে মিতা ওর দিকে তাকিয়ে বলে,—ছোটমা! তুমি না থাকলে আমি আর বাঁচব না।

মিতার মুখে ছোটমা ডাক শুনতেই চাঁপার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে! এ কি শুনছে সে আজ মিতার মুখে? এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল? এই মিতা কি সেই মিতা—যে কয়েক বছর আগে তাকে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারত না?

এ কি চেহারা হয়েছে ওর?

এক মুহূর্তে মনে পড়ে বিজয়ার ছবিখানা। যেন বিজয়া এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

—আমাকে ক্ষমা করো ছোটমা, না বুঝে তোমার মনে যে কষ্ট দিয়েছি সে জন্য আমি অনুতপ্ত। তুমি আমাকে বাঁচতে সাহায্য করো। কলকাতায় আমি আর থাকতে পারব না। আমার মা আর তুমি একপ্রাণ ছিলে, তাই তুমিও আমার মায়ের মত। কথা দাও, তুমি যাবে আমার সঙ্গে।

চাঁপা আর নিজেকে সামলাতে পারে না। মিতাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। পিষ্ট করতে থাকে তাকে।

—যাব, যাব মা, নিশ্চয় যাব। তোমাকে ছেড়ে এসে আমি একটি দিনও সুখে-শান্তিতে থাকতে পারিনি। তুমি যে আমার কতখানি তা তোমাকে আমি কেমন ক'রে বোঝাব।

—আমি জানি, সব জানি। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি জীবনটা কি। আজ সব বুঝতে পারছি ব'লেই সবচেয়ে আগে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে……। চাঁপা বুঝতে পারে না, 'সবাই' বলতে মিতা আর কাকে বলতে চাইছে। যাই হোক, আগে ওর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা দরকার, পরে সব শোনা যাবে।

এখানে এসে মিতা যেন নতুন প্রাণ পেল। চাঁপার সান্নিধ্যে ও আবার নতুন ক'রে নিজেকে আবিষ্কার করল।

চাঁপা চিরকালই কম কথা বলে, তবুও মিতার পাল্লায় পড়ে দিনরাত তার কথা ব'লে ব'লেই কাটে। নিত্য-নতুন প্রশ্ন, নতুন প্রসঙ্গ।

এমনি দিন-সাতেক কাটল চাঁপার কাছে। চাঁপা এ কয়দিন মিতাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে প্রচুর। রোজই একবার ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনত মিতাকে।

চাঁপা মন্দিরে এসে মিতার ভাবান্তর লক্ষ্য করে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না।

মিতাও বেশিদিন আর লুকিয়ে রাখতে পারে না তমালের কথা। চাঁপার কাছে সব কথা খুলে না বললে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সবকিছু বলতে গেলে লজ্জা এসে বাধা দেয়। আর যাই হোক, সে মাতৃস্থানীয়া ত বটেই। তবুও এ পৃথিবীতে ওর চেয়ে আপন ত আর কেউ নেই।

—তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। মাথা নীচু ক'রে বলল মিতা।

চাঁপাও একটা কিছু আশা করেছিল,—বল মা, আমার কাছে লজ্জা করতে নেই।

—আমি······বলতে গিয়েও বলতে পারে না।

চাঁপা কাছে এসে মিতার মাথায় আদর ক'রে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,—বল, বাবা ৺বিশ্বনাথ তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করবেন।

—আমি বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু বাবাকে ফাঁকি দিয়েছি।

—বিয়ের খবর আমি জানি। আর বাবাজীবন যে বিলেত গেছে, তাও জানি।

—সে সবকিছু আমার ইচ্ছামত হয়েছে। আমি তাকে চিরদিনের মত তাড়িয়ে দিয়েছি। আর সে কোনদিনও ফিরে আসবে না।

চমকে ওঠে চাঁপা।

—তাড়িয়ে দিয়েছ ?

—হ্যাঁ মা, তখন তাকে বুঝতে পারিনি, চিনতে পারিনি। তার দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে আমার স্বার্থ রক্ষা করতে আমি তাকে চরম আঘাত করেছি। বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রে তবে সে গেছে।

—জীবনে যা কিছু করলে সব ভুল। তাই আজ অনুতাপের আগুনে জ্বলছ। আমি আর কি করতে পারি বল। বাবা ৺বিশ্বনাথের চরণে সব কথা জানাও, তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

পূজা পাঠ শেষ ক'রে ওরা বাড়ি ফিরে আসে।

ক্রমে ক্রমে মিতার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখানে আর থাকা চলে না। অতএব কলকাতায় যাবার জন্য তৈরী হয়ে নেয়।

বাগান-মালী নটবরের উপর বাড়ির ভার দিয়ে চাঁপা মিতাকে নিয়ে আবার ফিরে আসে কলকাতায়।

॥ নয় ॥

এমনি ক'রে মিতা একদিন আইন পড়া শুরু করে।

বেশ কেটে যায় ওর দিনগুলো বইপত্র নাড়াচাড়া করতে-করতে। ইতিমধ্যে সুবীর কয়েকবার এসে দেখা ক'রে গেছে। মাঝে-মাঝে এসে গল্প-গুজব করে। তমালের সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়।

সুবীর মিতার আইন পড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেয়। মিতাও ঠিক বন্ধুর মত প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সুবীরের সঙ্গে পরামর্শ করে। কখনো বা বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে আসে—মার্কেটিং করে।

তমালকে ফিরিয়ে আনবার কথা প্রচুর ভেবেছে মিতা; কিন্তু এখনো কোন স্থির-সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারেনি। যত সে চেষ্টা করেছে তমালকে ভুলে থাকতে ততই তমাল যেন ওর মনের মধ্যে উঁচু আসন তৈরী করতে থাকে। পরোক্ষভাবে ও তমালের আদর্শকেই মেনে নিতে থাকে।

তমাল হয়ত কোনদিন ফিরে আসতে পারে। হয়ত মুখোমুখি ছু'জনের দেখা হতেও পারে। তখন তমাল নিশ্চয় আশ্বস্ত হবে যে মিতা তার চেয়ে নেহাত ছোট নয়। সে বসে সময় নষ্ট করেনি।

মনে পড়ে সেদিনকার তমালের প্রতিশ্রুতির কথা, বাংলা আমার মাতৃভূমি, প্রয়োজন হলে নিশ্চয় আসতে হবে। তবে যে পরিচয় শেষ ক'রে দিয়ে যাচ্ছি সে পরিচয়ের কথা নিশ্চয় ভুলে যাবো, কথা দিচ্ছি।

তাই মিতার মনের কোণে একটা অজানা আশঙ্কা জমা হয়ে থাকে, দোটানায় দুলতে থাকে মন।

পড়াশুনা চলতে থাকে ঠিক নিয়মমতই।

দিন যায়, দিন আসে। একটি একটি ক'রে দিনপঞ্জীর পাতা ঝরে যায়। সেদিনকার সেই অহঙ্কারী, যৌবন-গর্বিতা, উচ্ছৃঙ্খল মিতা রায় আজ বাঁধা পড়েছে সময়ের গণ্ডীতে। আজ সে অন্য এক জগতে এসে পড়েছে, লাইব্রেরীর বিরাট বইয়ের পাহাড়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে দিনরাত।

জয়লাভের একাগ্র সাধনায় ভুলে থাকে বাইরের জগৎকে।

এখন মিতার চেহারার বা বেশভূষার পরিবর্তন দেখে অনেকে অনেক কিছু বলাবলি করে।

এমন কি, বাড়ির চাকর-বাকরগুলিও মিতার হাবভাব দেখে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এর পর প্র্যাক্‌টিশ-এর পালা।

কিছুদিন হ'ল হাইকোর্টের প্রবীণ ও বাঘা ব্যারিস্টার বিশ্বনাথবাবুর কাছে জুনিয়ার হয়ে কাজ শুরু করেছে।

মাস ছয়েক যেতে-না-যেতেই মিতা সকলের প্রিয়পাত্রী ব'লে নিজেকে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। বার লাইব্রেরীর সকলের মুখে-মুখে ফেরে মিতার নাম।

বিশ্বনাথবাবু নিঃসন্তান ছিলেন। মিতার ব্যবহারে তাকে অত্যন্ত ভালবেসে ফেললেন অল্পদিনের মধ্যে। তিনি গর্বভরে সকলের কাছে স্বীকার করতেন,—মেয়েটার মত মেধাশক্তি আমি খুব কম দেখেছি। তাই বোধ হয় আর সব জুনিয়ারদের চেয়ে মিতাকে তিনি বেশী কেস দিতেন। বেছে-বেছে ইনটারেস্টিং কেসগুলোতে মিতাকে জুনিয়ার নিতেন। এজন্য অন্য জুনিয়াররা ওকে যে মনে-মনে একটু-আধটু হিংসা করত তা মিতা বুঝতে পারত। তাছাড়া ওকে খাটতে হত অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সেজন্য মিতা কখনো শ্রান্তি বোধ করত না।

অন্যান্য জুনিয়ারদের বিশ্বনাথবাবু বলতেন,—ক্রিমিনাল কেস সম্বন্ধে ওর কালেক্‌সন তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী। আমার বয়স হয়েছে, অনেক সময় অনেক ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, কিন্তু মিতার চোখে

ঠিক ধরা পড়ে। এই বয়সে আমার নিজের মেয়ে থাকলেও বোধ হয় এতখানি সাহায্য পেতাম না আমি।

মিতার কেসের হিয়ারিং-এর সময় জেরার সময়ে অনেকে আগ্রহ ক'রে শুনতে যান। ফিরে এসে লাইব্রেরীতে বসে বলাবলি করেন,—সত্যি, মিসেস সেন বইগুলোকে যেন গুলে খেয়েছেন। কোথা থেকে যে জোগাড় করেন এত রেফারেন্স, পয়েন্ট, যে নিজেকে লজ্জিত মনে হয়। আশ্চর্য মনে হয় আজ বারো বছর ধরেও অমন কথার বাঁধন শিখলাম না।

মিতার কাছে এ জীবন খুব ভাল লাগে। এই জীবনে বেশ রোমান্স আছে। নিত্য-নতুন ঘটনা-দুর্ঘটনার স্বাদ। অদ্ভুত ধরনের সব মক্কেল নিয়ে সময়টা কোথা দিয়ে কেটে যায় মনেই হয় না। এখানে সত্য প্রমাণিত হয় মিথ্যার কথার প্যাঁচে পড়ে, আর মিথ্যা প্রমাণিত হয় সত্যের আইনের মারপ্যাঁচে। আর্গুমেন্টের মুখে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ ক'রে এ লাইনে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমন আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

তারপর লাইব্রেরীতে ফিরে আসতে যখন প্রতিপক্ষের আইনজ্ঞ হাসতে-হাসতে বলেন,—সত্যিই মিসেস সেন, আপনার সুন্দর যুক্তির কাছে হেরে গিয়েও আনন্দ লাগে; তখন গর্বে মিতার বুক ফুলে ওঠে।

যে-কোন বিচারকের কাছে মিতার কেস পড়ত তাঁরাও বেশ সচকিত হয়ে থাকতেন। অবাক হয়ে শুনতেন ওর আর্গুমেন্টের স্টাইল দেখে। প্রিভিয়াস রেফারেন্স ওর এমন মুখস্ত, যেন ও নিজে সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। জাজ্‌মেন্টের সময় অনেক ইতস্ততঃ করছেন দেখে মিতা বই খুলে দেখিয়ে দিত প্রিভিয়াস জাজমেণ্ট। এর পর বিচারকের আর কিছু বলবার থাকত না।

এদিকে রোজগার বেড়েছে প্রচুর। কিন্তু এত টাকা দিয়ে ও করবে কি? অর্থের লোভের চেয়ে ওর লোভ ছিল বেশী অপর পক্ষকে পরাজিত করা।

জিদই ওর জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস।

কিছুদিনের মধ্যে মিতার বাড়ির লাইব্রেরী ঘরে বেশ ভীড় জমে ওঠে।

পরিচিতরা সময়মত আজকাল ওর খোঁজ নিতে আসেন। অবশ্য আসল কারণ দুষ্প্রাপ্য সব আইনের বই থেকে কিছু মসলা সংগ্রহ করা।

কথায় কথায় দু-একজন ওর স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু মিতা তাদের সুকৌশলে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তার স্বামী ফরেনে আছেন। তারপরেই অন্য প্রসঙ্গ তুলে ওকথা চাপা দিয়েছে।

এমন ক'রে দিন কাটতে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মিতা বিশ্বনাথবাবুর চেম্বার হয়ে ফিরবে, এমন সময় বিশ্বনাথবাবু মিতাকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন।

—নাঃ, এবার আমি সত্যিই বৃদ্ধ হয়েছি। কিছুই মনে থাকে না আজকাল। আজ দুদিন হল একটা কেস নিয়েছি। ফাইলটা নিয়ে যাও। অবসর সময়ে ভালো ক'রে স্টাডি করো। আসামী সাত বছর ফেরার থাকার পর সারেণ্ডার করেছে। বাদীপক্ষ আমার পুরনো মক্কেল। বিরাট জমিদার।

—কেসটা কি মার্ডার কেস? প্রশ্ন করে মিতা।

—তা নয়ত কি? সামনের সোমবার তারিখ আছে।

—আচ্ছা আমি চলি। সময়মত দেখব'খন।

বাড়ি ফিরে অন্যান্য কাজের শেষে ফাইলটা খুলে বসে মিতা।

আসামী জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের চাকরি করত। ঘটনার দিন রাত্রে জমিদার আসামীকে খাজাঞ্চীর কাছ থেকে আঠারো হাজার টাকা নিয়ে পরদিন সকালে সদরে রওয়ানা হবার জন্য আদেশ করেন। খাজাঞ্চী ও আসামী একই সঙ্গে টাকার হিসেব ক'রে সিন্দুক বন্ধ করেন। আসামী বাড়ি চলে আসে, খাজাঞ্চী

সেই ঘরেই রাত্রে ঘুমোতেন। আসামী বয়সে বৃদ্ধ। যৌবন থেকেই এই সেরেস্তায় কাজ করছেন।

পরদিন সকালে আসামী জমিদার বাড়ির কাচারী ঘরে আসতে গিয়ে দেখেন বাড়ি লোকে লোকারণ্য। আসামী এসে দেখে কাচারী ঘরে খাজাঞ্চী মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। সিন্দুক খোলা।

জমিদার মশাই আসামীকে চাবি চাইতে আসামী পকেটে হাত দিয়ে চাবি পায় না। কিন্তু তখন তার কথা কেউই বিশ্বাস করতে চায় না। জমিদার পুলিশ ডাকেন। সেই সুযোগে কোন প্রকারে আসামী পালিয়ে যায়।

তারপর দীর্ঘ সাতটি বছর কেটে গেছে। আসামী নিখোঁজ।

কেসটিরও কোন কূল-কিনারা আর হয়নি :

আজ একমাস হল আসামী নিজে ধরা দিয়েছে পুলিশের কাছে।

কেসটা সত্যিই ইন্‌টারেস্টিং। অপর পক্ষে অর্থাৎ আসামী পক্ষে রয়েছেন বিখ্যাত প্রবীণ ব্যারিস্টার এ. গাঙ্গুলী।

মিতা কেসটাকে ভালো করে সাজিয়ে নেয়। যদিও আসামীর বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ নেই। এমনও ত হতে পারে, আসামী ভয়ে পালিয়ে গেছে। যাই হোক, কেস যখন হাতে এসেছে তখন জিততেই হবে যে-কোন প্রকারে। সেজন্য সিনিয়র বিশ্বনাথবাবুও আছেন, তবুও নিজের মত তৈরী হয়ে নেয় মিতা।

তার পরদিনই মিতা কোর্ট-ফেরত বিশ্বনাথ ঘোষালের বাড়িতে গিয়ে বাকি কাজগুলো শেষ ক'রে মোটামুটি একটা ছক করে রাখে। বাড়িতে ফিরেও সর্বদা তার একই চিন্তা। ব্যারিস্টার গাঙ্গুলীকে পরাস্ত করতে না পারলে শান্তি নেই।

আজ সোমবার। কেসের তারিখ।

সকাল থেকে ব্যস্ত রয়েছে ডায়েরী, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন, পোস্টমর্টম্ রিপোর্ট প্রভৃতি নকলপত্র নিয়ে।

কোর্টে এসে লাইব্রেরীতে বসতেই কেসচার্ট দেখে নেয় মিতা। এখনো অনেক দেরী। ততক্ষণ একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক ভেবে গাউনটা খুলে টেবিলের উপর রেখে মাথা নীচু ক'রে বসে। মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তা এসে ভীড় করছে।

এমন সময় ব্যারিস্টার দাশগুপ্ত পাশের টেবিল থেকে প্রশ্ন করেন,—এই যে মিসেস সেন, আজ যাচ্ছি আপনার কেসটা স্টাডি করতে।

—সিওর। আসুন না।

—কেসটা শুনেছি। কি মনে হয় আপনার?

—এখনই কিছু বলা শক্ত। মেটিরিয়াল কম ব'লে বডিটা খুব উইক। দেখা যাক।

—প্রতিপক্ষ নাকি বাঘা ব্যারিস্টার এ. গাঙ্গুলীকে ঠিক করেছে। শুনলাম সদ্য বিলেত-ফেরত একজন জুনিয়ার হয়ে এসেছে।

মিতা ওর কথায় তেমন আমল দেয় না। একটু চিন্তা ক'রে বলে, —আজ প্রথম দিন ফাইল স্টাডি করতেই কেটে যাবে।

—সার্টেন্‌লি। জবাব দেন মিঃ দাশগুপ্ত।

জাস্টিস্ বসুর ঘরে কেস। লাইব্রেরীর বারান্দার শেষের ঘরটা। লাইব্রেরীর কাছাকাছি ব'লে অনেকে এসেছেন দেখবার জন্য। এখনো প্রথম কেসটা শেষ হয়নি ব'লে সকলে চুপ ক'রে বসে আছেন।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই এক নম্বর কেসটা শেষ হলে বিচারক মিতার কেসের ফাইল খুলে বসলেন।

মিঃ বসু উঠে দাঁড়ান বাদীপক্ষের হয়ে।

আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায় প্রৌঢ় এক ব্যক্তি। লম্বা বলিষ্ঠ গঠন, মাথার চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখে-মুখে হতাশা-জড়িত বেদনার ছাপ। গায়ে একটি ফতুয়া গোছের জামা, পরনে ধুতি।

প্রথমে মিঃ বসু আসামীকে ভাল ক'রে দেখে নেন। লোকটি

মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তবুও মিঃ বসু বেশ বুঝতে পারেন যে, লোকটা মার্জিত রুচিসম্পন্ন এবং শিক্ষিত। এই লোকটাকে খুনী ব'লে ভাবতে কষ্ট লাগে। ওর অবয়বে কোথাও নিষ্ঠুরতার এতটুকু ছাপ নেই, তবুও খুনের দায়ে সে অভিযুক্ত। মিতা তার বিপক্ষে থেকে চেষ্টা করবে নিজেকে জিতিয়ে অপরাধ প্রমাণ করিয়ে অভিযুক্ত করতে। তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ আর তদ্বিরের উপর নির্ভর করছে কেসের ফলাফল। টাকার লোভে মানুষ করতে পারে না এমন হীন কাজ আর নেই।

সর্বপ্রথমে ন্যায়ালয়ের নিয়মানুয়ায়ী শপথ গ্রহণ কাজ শেষ হলে মিঃ বসু এগিয়ে যান আসামীর দিকে। আসামী বিশ্বনাথবাবুর মুখের দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নেয়।

—আপনার নাম কি? প্রথম প্রশ্ন বিশ্বনাথবাবুর। তাঁর পিছনে মিতা গম্ভীরভাবে বসে লক্ষ্য করে।

—ভবানীপ্রসাদ সেন।

—পেশা?

—আগে জমিদারের সেরেস্তায় নায়েবী করতাম, তারপর গত সাত বৎসর যাবৎ স্কুলমাস্টারী করতাম।

—কোন্ জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করতেন?

—শ্রীযুক্ত তারিণীশঙ্কর বিশ্বাস।

—আচ্ছা, আপনার চাকরি থেকে কি আপনাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল?

—না, আমি নিজেই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

—লিখিত-পড়িতভাবে?

—না।

—তবে?

—মিথ্যে বদনামের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়েছিলাম।

—কিসের বদনাম?

—মিথ্যে খুন ও চুরির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।

—কে খুন করেছিল?

—তা আমি জানি না।

—কাকে খুন করা হয়েছিল?

—বৃদ্ধ ক্যাসিয়ার হরিবাবুকে।

—খুনের সঙ্গে টাকাও চুরি হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কত টাকা?

—মোট কত টাকা তা ঠিক জানি না, তবে একটা থলিতে বারো হাজার টাকা ছিল সেই সিন্দুকে।

—কি ক'রে জানলেন একটা থলিতে বারো হাজার টাকা ছিল?

—ঐ টাকাটা আমিই রেখেছিলাম হরিবাবুর কাছে সেই রাতে।

—টাকাটা আপনি নিজের হাতে সিন্দুকে রেখেছিলেন?

—না, হরিবাবুর হাতে দিয়েছিলাম। তিনিই রেখেছিলেন।

—সিন্দুকের চাবি কার কাছে থাকত?

—একটা আমার কাছে থাকত আর একটা হরিবাবুর কাছে।

—হরিবাবু কি আপনার চাবি দিয়ে দরজা খুলেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কেন, হরিবাবুর নিজের চাবি ছিল না?

—ছিল, কিন্তু তখনকার সব চাবির সঙ্গে নীচেকার সিন্দুকের চাবি উপর তলায় বড়বাবুর ঘরের আলমারিতে বন্ধ থাকত। প্রতিদিন রাত্রে হরিবাবু নিজের কাজ শেষ ক'রে চাবি উপরে দিয়ে আসতেন। কখনো-সখনো দরকার মত আমার চাবি দিয়ে আমি কাজ চালিয়ে নিতাম।

—তা টাকার তোড়াটা রাখবার পর আপনি পাশের ঘরে গেলেন কেন?

—কারণ সেখান থেকেই বড়বাবু আমাকে টাকাটা দিয়েছিলেন। আমি তোড়াটা হরিবাবুর কাছে দিয়ে আবার পাশের ঘরে যাই দরকারী কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে রেখে আসবার জন্য। তারপর আমার চাবির কথাটা খেয়াল ছিল না। একেবারে খেয়াল ছিল না বললে ভুল বলা হয়, উপর থেকে পকেটে হাত দিয়ে আন্দাজ ক'রে দেখলাম চাবি রয়েছে, কিন্তু সেটা আমার বাড়ির চাবি।

—আপনার কাছে ক'টা চাবি থাকত ?

—দুটো। একটা আমার আর একটা সেরেস্তার। মোট দুটো রিং থাকত আমার কাছে।

—তারপর আপনি কি করলেন ?

—তারপর সোজা বাড়ি চলে এলাম।

—বাড়িতে গিয়ে আর চাবির কথা মনে হয়নি আপনার ?

—আজ্ঞে না।

—তারপর ?

—পরদিন সকালে বড়বাড়ি (জমিদারবাড়ি)-র সামনে আসতে ভীষণ ভীড় দেখে প্রথমটা একটু ভয় পেয়েছিলাম। পরে ভিতরে এসেই দেখি কাচারী ঘরের সামনে জমিদারবাবুর ভাগ্নে সমীর খুব চিৎকার করছে পুলিশে খবর দেবার জন্য। তারপর আমাকে দেখেই তার সকল আক্রোশ এসে পড়ল আমার উপর। আমি ব্যাপারটা ভালো ক'রে জানবার জন্য উপরে বড়বাবুর কাছে যাই। কিন্তু বড়বাবুও আমাকে দেখে একেবারে মারমুখো হয়ে তেড়ে এলেন।

—আচ্ছা আপনি হরিবাবুর মৃতদেহ দেখেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—কেমন অবস্থায় ছিলেন তিনি ?

—হাত দুটো পিছন দিকে বাঁধা ছিল। মুখের মধ্যে একটা গামছার টুকরো দিয়ে উপর থেকে বেশ শক্ত ক'রে বাঁধা ছিল। সিন্দুকের দরজা খোলা। সিন্দুকের দরজায় তখনো চাবিটা ঝুলছে।

—তখনো আপনার চাবির কথা মনে পড়েনি ?

—হ্যাঁ, সিন্দুকের দরজায় আমার চাবির রিংটা দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম এবং তখনই আমি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলাম।

—তারপর ?

—তারপর বড়বাবু আমার আগেই উপর থেকে নীচে নেমে এলেন সমীরকে ডাকতে-ডাকতে। আমি শেষবার চেষ্টা করলাম বড়বাবুর কাছে আসল ঘটনাটা কি জানবার জন্য, কিন্তু বড়বাবু কোনদিকে কর্ণপাত না ক'রেই পুলিশ ডাকতে হুকুম দিলেন। উপরে দাঁড়িয়ে আমি তখন ভাবছি কি করব। এক মুহূর্ত পরেই পুলিশ এসে আমায় হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে সকলের সামনে দিয়ে। সে-কথা কল্পনা করতেই আমার শরীর শিউরে উঠল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এলাম পিছন দিকের বারান্দায়। সেখান থেকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে পালিয়ে এলাম।

—আপনি কি মনে করেছিলেন যে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন ?

—না, তাহলে সারেণ্ডার করতাম না। তখনকার সেই পরিবেশে একমাত্র পালানো ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। যে কোন প্রকারে বড়বাবু আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতেন।

—তা এতদিন আত্মসমর্পণ করেননি কেন ?

—মোকদ্দমা চালাবার মত নিজেকে তৈরী করছিলাম। তাছাড়া আমার একমাত্র নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করছিলাম।

বিশ্বনাথবাবু বিচারকের উদ্দেশ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন,—মাই লর্ড! হিয়ার ইজ দি এণ্ড অফ মাই আর্গুমেণ্ট।

বিশ্বনাথবাবু নিজের আসনে বসে পড়েন। সমস্ত আদালত-কক্ষ নিস্তব্ধ।

তারপর অপর পক্ষ থেকে উঠে দাঁড়ালেন যিনি, সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর উপর। মিতাও তাকিয়ে দেখল সেই উদ্ধত যুবকের দিকে।

কিন্তু একি ! মিতা ভুল দেখছে না ত ?

না। তবে কি তমাল ফিরে এসেছে ? নিশ্চয় তমাল। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হতে চায় না মিতার। তবুও এ যে দিনের মত সত্য।

মিতার দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন একসঙ্গে মোচড় দিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ওর শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে। কে যেন যাদুবলে ওর সমস্ত শক্তিকে কেড়ে নিয়েছে।

তমাল উঠে দাঁড়িয়ে বিচারপতির দিকে তাকিয়ে বলে,—অনারেবল মাই লর্ড ! আমি মাননীয় জমিদার তারিণীশঙ্কর বিশ্বাসকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।

বিচারপতি মাথা কাৎ ক'রে সম্মতি দেন।

তারিণীশঙ্কর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে তমাল তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে,—আপনার নাম ?

সাদা-কালো মেশানো পরিপাটি চুল দেখলেই তারিণীশঙ্করের পঞ্চাশোর্ধ বয়সের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না কারুরই। পোশাক-পরিচ্ছদে বিত্তবার সুস্পষ্ট ছাপ। লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গঠন।

—তারিণীশঙ্কর বিশ্বাস। উত্তর দিলেন তারিণীশঙ্কর।

—আসামী ভবানীপ্রসাদ সেনকে আপনি চেনেন ?

—হ্যাঁ।

—কি সূত্রে ?

—গত ত্রিশ বৎসর আমার সেরেস্তায় নায়েবী করেছে ভবানী।

—ও। তাহলে এতদিন আপনাদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ ছিল ?

—হ্যাঁ।

—আপনি তাকে বিশ্বাস করতেন ?

—তা বিশ্বাস না করলে কি এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে পারত ?

—এক কথায় জবাব দিন, হ্যাঁ অথবা না।

—হ্যাঁ।

—আর এই দীর্ঘদিন হরিবাবুও তার সঙ্গে কাজ করেছেন?

—হ্যাঁ।

—ভবানীপ্রসাদ তার চাকরি-জীবনে এই রকম টাকার আদান-প্রদান কতবার করেছেন?

—বহুবার। অর্থাৎ প্রায়ই করতে হত।

—সবচেয়ে বেশি সংখ্যক টাকা কত তিনি নাড়াচাড়া করেছেন?

—সঠিক মনে নেই, তবে পঞ্চাশ-ষাট হাজার হবে নিশ্চয়।

—সেই ত্রিশ বৎসরে কতবার তাঁর হিসেবে গোলমাল অর্থাৎ অমিল হয়েছে?

—তেমন ত মনে পড়ছে না।

—হ্যাঁ কি না বলুন।

—না।

—কখনো কোন অবিশ্বাসের কাজ করেছেন তিনি?

—মনে পড়ছে না।

—প্লিজ, এক কথায় জবাব দিন।

—না।

—আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে খুন হবার আগে পর্যন্ত আপনার কি ধারণা ছিল?

—ভালো।

—আসামীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোন বিশেষ ঘটনা আপনি জানেন?

—হ্যাঁ। তার স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে সে ব্রহ্মচর্য পালন করত। নিরামিষাশী ছিল।

—এই দুর্ঘটনার দিন প্রথম হরিবাবুর মৃতদেহ কে দেখেছিল?

—একটা চাকর প্রথম দেখে, সে চিৎকার ক'রে আমাকে

ডাকতে আমি নীচে এসে দেখি হরিবাবু খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

—তখনই কি আপনার মনে হয়েছিল যে আসামী ভবানীপ্রসাদই হত্যাকারী।

—না। প্রথমে আমার বিশ্বাসই হয়নি যে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে। তারপর সিন্দুকের দিকে তাকিয়ে দেখি সিন্দুকের দরজায় ভবানীর চাবি ঝুলছে। প্রথমটায় আমার বিশ্বাস হতে চায়নি কিন্তু ভবানীর চাবি দেখেই আমার মনে বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'ল যে হত্যাকারী ভবানী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

—আপনার কি ইচ্ছা আসামী ভবানীপ্রসাদের ফাঁসি হোক?

—আমার ইচ্ছা অপরাধী তার কৃতকর্মের ফলভোগ করুক।

মিঃ টি. সেন বিচারকের দিকে তাকিয়ে বললেন,—মাই লর্ড! হিয়ার ইজ দি এণ্ড অফ মাই আর্গুমেণ্ট।

বিচারক আবার তারিখ দিয়ে উঠে গেলেন।

আদালত-কক্ষ আবার সরগরম হয়ে ওঠে। সকলে উঠে দাঁড়ায়। মিতা সকলের আগে বেরিয়ে আসে বাইরে। কয়েক মুহূর্ত পরে তমালও বেরিয়ে আসে। মিতা পিছন থেকে ডাকতে তমাল থমকে দাঁড়ায়।

ছ'জনে তাকায় ছ'জনের দিকে। তমাল অবাক হয় মিতার পরিবেশ আর তার চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি দেখে।

আর মিতা যেন ভয় পায় তমালের চোখে আগুনের শিখা দেখে।

—দয়া ক'রে আমার গাড়িতে একটু আসবে? ভীষণ দরকার।

—আমার সঙ্গে আপনার কোন দরকার থাকলে বার লাইব্রেরীতে বসে বলতে পারতেন। দৃপ্তকণ্ঠে বলল তমাল।

—পারতাম, কিন্তু সে-কথা এখানে বলবার নয়। প্লিজ একটিবার এসো। তোমার কোন অবমাননা হবে না।

তমাল এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, —বেশ, চলুন কোথায় যেতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা হেম লজে এসে পৌঁছয়।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় নন্দর মা দেখতে পায় তমালকে। এক মুহূর্তে বাড়িশুদ্ধ হৈ-চৈ পড়ে যায়।

মিতার ঘরে ঢুকতেই তমালের দৃষ্টি পড়ে টেবিলের উপর রাখা বিয়ের রাতে তোলা সেই ফটোখানার দিকে। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে আরো তিনখানা এনলার্জ ফটোগ্রাফ। প্রত্যেকটি ফ্রেমে টাট্‌কা ফুলের মালা। তমালকে বসতে ব'লে মিতা সোফাটার কাছে এসে দাঁড়ায়।

—বসো, একটু চা বসি। বলল মিতা।

—নো, থ্যাঙ্কস্। গম্ভীর কণ্ঠে বলল তমাল, কি জন্যে ডাকা হয়েছে এখানে?

—বলবার অনেক কিছুই আছে। কিছুটা আমার 'চিঠিতে লিখেছিলাম, নিশ্চয় পেয়েছ?

—পেয়েছিলাম।

—তোমার সাধনায় ব্যাঘাত হবে ব'লে চিঠি লিখে বিরক্ত করিনি।

—ধন্যবাদ। আর কিছু?

—হ্যাঁ, আপাততঃ আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে। যে কেসটা তুমি নিয়েছ সেটা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চাইছেন।

—এটা আমার মর্যাদার প্রশ্ন। তুমি আমার বিপক্ষে থাকলে আমি কিছুতেই জিততে পারব না। তোমাকে দেখবার পর থেকে আমি নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল অনুভব করছি।

—মর্যাদার প্রশ্ন আমারও জড়িয়ে রয়েছে ঐ কেসের সঙ্গে।

—প্লিজ, যে-কোন শর্তে আমার সম্মান রক্ষা করো।

—অসম্ভব। কেস ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

—যদি টাকার প্রশ্ন হয় তাহলে যত টাকা চাও আমি দেব তোমাকে।

—নিজেকে দিয়ে সকলের বিচার করবেন না। কর্তব্য বলে একটা জিনিস আছে, আশা করি সেটা ভুলে যাননি।

মিতা বুঝতে পারে তমাল বিরক্তি বোধ করছে। মিতা জানে পর্বতের মত অচল অটল ওর জিদ। অতএব শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবে আজ। তমালের সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ে।

চমকে ওঠে তমাল, উঠে দাঁড়ায়।

—ছিঃ ছিঃ, এ কি করছেন আপনি!

—অপমানের কিছুই করিনি। স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোন লজ্জা থাকতে নেই।

তমাল মিতার পাশ কাটিয়ে সরে যেতে মিতা তমালের হাত দু'খানা ধরে। তমাল আশ্চর্যের ভাব ফুটিয়ে তোলে চোখে-মুখে।

—স্বামী-স্ত্রী? আপনি ভুল করছেন, আমি এখনও বিবাহ করিনি।

—না না তমাল, তুমি অমন ক'রে বলো না। বিশ্বাস করো আমি সে মিতা নই। সে মিতা মরে গেছে। তোমার সামনে যাকে দেখছ সে সত্যিই তোমার সহধর্মিনী।

—ইম্পসিবল্।

—তুমি আমাকে অস্বীকার করতে পারো, কিন্তু আমি পারব না তোমাকে ছেড়ে থাকতে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে ফেলে যেয়ো না। তুমি চলে যাবার পর আমি তোমার অভাব অনুভব করেছি, বুঝতে পেরেছি বিয়ের গুরুত্ব। সেই থেকে নিজেকে তিল-তিল ক'রে অনুতাপের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি! একটিবার তাকিয়ে দেখ আমার দিকে, আমি নিজেকে তোমার উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলেছি।

—তা আর হয় না মিতা দেবী। বহুদিন আগে কোন এক

রাত্রের এক অযাচিত মুহূর্তে এক চোরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সে কথা আজ আর মনে না করাই ভালো। শুকিয়ে-যাওয়া ক্ষতকে খুঁচিয়ে তুলে আবার ব্যথা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এবার মিতার মাথা নত হয়ে আসে। এ কথার জবাব তার নেই তা সে জানে, তবুও তমালকে হারানো চলবে না। তমালকে বাদ দিয়ে নিজের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পায় না। তবুও যতখানি সম্ভব নম্রস্বরে বলল,—না বুঝে সেদিন যে অন্যায় করেছি তা ক্ষমা করো। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দাও আমাকে। জীবনযুদ্ধে আমি পরিশ্রান্ত। আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে বাঁচতে দাও।

তমাল এবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। এর পর থাকলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। মিতা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে তমাল লক্ষ্য করে। ওর ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়া দেখে তমাল চিন্তিত হয়ে পড়ে।

—আচ্ছা আমি চলি। কথা দিচ্ছি, এই কেসটা শেষ হলে কলকাতায় আর প্র্যাক্‌টিশ করব না।

—না, তুমি যেতে পাবে না। এই যা কিছু দেখছ এসব তোমার। শুধু তোমার আসা অবধি সময়টা কাটাবার জন্য আইন পড়েছিলাম, আর আমি কোথাও যাব না। সব ছেড়ে দিয়েছি, ভুলে গিয়েছি আমার বিগত জীবন। তুমি বিশ্বাস করো তমাল, আমি তোমার কাছে অবিশ্বাসিনী নই। কোনদিন আর তোমার অবাধ্য হব না। তুমি আমি আর সুবীর ছাড়া কেউ জানে না এ রহস্য। তুমি আমাকে আর আঘাত ক'রো না, আমি পারবো না আঘাত সহ্য করতে। তোমার সব দাবী পাওনা তুমি বুঝে নাও, আমি আর পারছি না।

আর কিছু বলতে পারে না মিতা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আজ তার কান্নার মধ্যে

সর্বহারার রিক্ততা ফুটে ওঠে। আজ তমালের সামনে তার কোন লজ্জা নেই ; নেই কোন অভিমান, কোন অহঙ্কার।

তমাল এগিয়ে যায় ওর কাছে। ধীরে ধীরে ওর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে,—কঠোর সাধনা ক'রে তোমাকে ভুলেছি মিতা। জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে দিন কাটানো যায় বটে, কিন্তু হয় না মনের তৃপ্তি। দুর্ভাগ্য আমারই। আমি তোমাকে সহজভাবে নিতে পারবো না। আমিও মানুষ, আমারও যে হৃদয় থাকতে পারে, প্রেম-ভালবাসা থাকতে পারে, আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, সে-কথা তুমি সেদিন স্বীকার করোনি। দারুণ আঘাতে আমার জীবনের সব স্বপ্নকে তুমি ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছ। তাই আমার ইচ্ছা, জোড়ার দাগ বুকে নিয়ে মিথ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার চেয়ে ভুলে থাকাই ভালো অতীতের স্মৃতি। একটা কথা তোমায় ব'লে যাই, আমার জীবনে তুমিই প্রথম ও শেষ নারী। সেই স্মৃতিটুকু নিয়েই আমি বেঁচে থাকতে চাই। আচ্ছা, আমি চললাম।

তমাল বেরিয়ে আসতেই চাঁপার মুখোমুখি হতে দাঁড়িয়ে যায়। চাঁপা মাথা নীচু ক'রে ধীর স্বরে বলে,—আমাকে আপনি চেনেন না, ওরই মা-বাপের আশ্রয়ে আমি সারাজীবন কাটিয়েছি। মেয়েটার জন্য বড্ড দুঃখ হয়। ওর পাপের শাস্তি ও পেয়েছে। আপনাকে না পেলে ওকে বাঁচাতে পারব না।

চাঁপা মাথা নীচু করে।

তমাল এক মুহূর্ত থেমে বলে,—এখনই এ সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ আমার নেই, পরে ভেবে আপনাকে জানাব। আর পরিচয়ের কথা বললেন যখন তখন জেনে রাখুন, চাক্ষুষ এই আপনাকে দেখলেও আমি অনেকখানি বেশী চিনি আপনাকে। আচ্ছা, এখন আমি চলি। আপনি আপনার মেয়ের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন।

আর এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে তর-তর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

যায় তমাল। চাঁপা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সিঁড়ির দিকে। চোখে তার অন্যদৃষ্টি।

ছুটে আসে মিতা চাঁপার কাছে—তমাল চলে গেছে, ছোটমা। ওকে ধরে রাখতে পারলাম না। আর ও আসবে না কখনো, কি হবে ছোটমা ?

কান্নায় ভেঙে পড়ে মিতা। কথা বলতে পারে না। প্রস্তর-মূর্তির মত চাঁপা ওকে ধরে ঘরে নিয়ে কোচটার উপর বসিয়ে দেয়।

—আমি আর কি করব বল হতভাগী! অমূল্য-রতন তুই পায়ে ঠেলে ফেলেছিস্, খানিকটা কেঁদে মনটাকে একটু হালকা করে নে, দেখিস্ তমাল একদিন ফিরে আসবেই।

॥ দশ ॥

এর পর মিতার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে থাকে। পর পর কয়েকদিন কোর্টে বের হতে পারেনি। সিনিয়র বিশ্বনাথবাবুকে সংবাদ পাঠিয়েছে শরীর অত্যন্ত খারাপ। এমনি ক'রে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে বাইরের জগত থেকে নিজেকে আলাদা ক'রে নিজের ঘরে বন্দী ক'রে রাখে। কোন কিছুতেই যেন আর আসক্তি নেই।

চাঁপা আর নন্দর মা বহু চেষ্টা ক'রেও ওকে বোঝাতে পারেনি। একমাত্র দীর্ঘশ্বাস সম্বল ক'রে তিল-তিল ক'রে কাটতে থাকে ওর দিন।

তমালও কলকাতায় এসে বিব্রত হয়ে পড়েছে। ও ভাবতেও পারেনি যে, এমন পরিবেশে মিতার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে। উভয় সমস্যার মধ্যে বিচলিত হয়ে পড়ে তমাল।

একদিকে পিতাকে মুক্ত করা, আর অন্যদিকে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সমস্যার সমাধান করা। মিতার অবস্থার জন্য মাঝে-মাঝে

মনের মধ্যে হা-হুতাশ করে ওঠে, কিন্তু ওর প্রতিজ্ঞার কাছে তার কোন মূল্যই নেই।

এতদিন সুবীর সুযোগ পেলেই চলে আসতো তমালের কাছে। সুবীর নিজে কখনো মিতার নামও মুখে আনেনি, তাছাড়া প্রসঙ্গক্রমে তমাল উত্থাপন করলেও অত্যন্ত সরলভাবে অন্য প্রশ্নের অবতারণা করেছে এবং আসল বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে। আজও তমালের মুখে মিতার প্রসঙ্গ উঠতে সুবীর সুযোগ বুঝে জবাব দিল।

—আগে কেসটার একটা সুরাহা হোক, তারপর একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। উনি আজকাল কোর্টেও আসছেন না।

—খোঁজখবর রাখিস্ দেখছি। তা তোর মাথাব্যথাটা দেখছি আজকাল বেশ বেড়েছে।

—তমাল!

—তুই অন্ততঃ আমাকে মিতার কাছে ফিরে যাবার কথা বলিস্ না। অতীতকে আমি ভুলে গিয়েছি। বর্তমানই আমার কাছে বাস্তব। ভবিষ্যতের জন্য আমি চিন্তা করি না। ভুল যদি কেউ ক'রে থাকে ত তাকে তার ফল ভোগ করতে দে। পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে কত লোক কত ভুল করছে, তার কথা তোর মত এমন করে কেউ চিন্তা করছে কি?

—তমাল, অতীতকে যদি ভুলেই গিয়ে থাকিস্ তাহলে আমি আবার অনুরোধ করছি, বৌদিকে ক্ষমা করে দে। তুই বুঝতে পারছিস্ না, তোকে না পেলে ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি দেখেছি তোর বিলেত যাবার পর প্রতিটি মুহূর্ত তোর জন্য অপেক্ষা করেছে। এখন যে মুহূর্তে সে জানতে পারবে তোকে সে সত্যিই পাবে না, হয়ত তখনই একটা কিছু করে বসবে। তাই কি তুই চাস?

এবার তমাল হেসে ফেলে সুবীরের কথায়।

—বুঝেছি, পাওনা-গণ্ডার কণ্ট্রাক্ট ক'রে নিয়েছিস্ বুঝি?

—ননসেন্স! এতখানি হৃদয়হীন তুই! আমাকেও তুই এমনি

ক'রে বলতে পারলি ? বেশ, এই চললাম, আর কখনো তোর কাছে আসব না।

—দাঁড়া—দাঁড়া। তমাল সুবীরের হাত চেপে ধরে,—আজ আমার কেসটার জাজমেণ্ট হবে। অন্ততঃ ততক্ষণ তুই আমার সঙ্গে থাক।

—না না, আমি চলি। সত্যিই পর কখনো আপন হয় না।

সুবীর আর দাঁড়ায় না। তমালের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। তমাল সুবীরের চলার পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, আমি কি সত্যিই ভুল করছি ?

দশটা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে আদালত-কক্ষে তিলধারণের জায়গা থাকে না। বিচারের শেষ দিন আজ।

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে এই নাটকের শেষ দৃশ্য দেখবার জন্য।

যথাসময়ে বিচারক প্রবেশ ক'রে আসন গ্রহণ ক'রে বসলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী বিচারককে সম্মান প্রদর্শন করে।

বিচারক আদেশ করেন কেস শুরু করতে।

আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার মিঃ গাঙ্গুলী উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানান আজ তাঁর জুনিয়ার মিঃ টি. সেন, বার-এট-ল কিছু বলবেন।

মিঃ সেন অর্থাৎ তমাল উঠে দাঁড়াতে বিচারক অনুমোদন করেন। তমাল সামনে এসে দাঁড়িয়ে একবার আসামীর কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে আর একবার আদালতের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বিচারককে উদ্দেশ্য ক'রে বলে,—অনারেবল মাই লর্ড ! এই কেসের সবচেয়ে বিস্ময়কর অধ্যায় প্রমাণসহ আমি ধর্মাধিকরণে উপস্থিত করব, কিন্তু তার আগে আমার একটি লিখিত আবেদন আছে।

একখানি চার-ভাঁজ-করা কাগজ বিচারকের দিকে বাড়িয়ে দেয় তমাল। বিচারক সেখানি দেখে একবার তমালের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাগজখানিতে কি লিখে সামনে কোর্ট ইনস্‌পেক্টারের দিকে বাড়িয়ে দেন।

কোর্ট ইনস্‌পেক্টার কাগজখানি একবার দেখে দু-পা পিছিয়ে

সোজা আদালত-কক্ষের দরজার কাছে গিয়ে প্রহরারত শান্ত্রীকে চুপি-চুপি কিছু বলতে শান্ত্রী তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ ক'রে দেয় এবং আরো চারজন শান্ত্রী দরজার কাছে পাহারায় নিযুক্ত হন।

সমস্ত আদালত-কক্ষ নীরব নিস্তব্ধ। থমথমে ভাব। সকলের চোখে-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। কেউই অনুমান করতে পারেন না হঠাৎ নীরবে এসব কি হচ্ছে।

বাঁদিকের চেয়ারে বিশ্বনাথবাবু বার-এট-ল এবং তাঁর অন্য দু'একজন জুনিয়রের সঙ্গে মিসেস মিতা সেন বসে আছে। মিতার পিছনের চেয়ারে চাঁপা আর নন্দর মা বসেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত বিস্ময়ে স্তম্ভিত মিতা তমালের কার্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে। সে ভাবে, আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি। তমাল তার মোটা ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিকে এক লমহায় চোখ বুলিয়ে নেয় মিতার পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে।

তমাল বিচারকের দিকে তাকালে তিনি মাথা নেড়ে শুরু করতে অনুমতি দেন। মুখে তাঁর প্রশান্তির রেখা।

উপস্থিত সকলেরই একমাত্র ধারণা বা বিশ্বাস আসামী দোষী সাব্যস্ত হবেই এবং তার কঠিন শাস্তিও হবে। কারণ আসামীর স্বপক্ষে তেমন কোন জোরদার প্রমাণ করাতে পারেনি। মিতা এবং বিশ্বনাথবাবুও তাই নিশ্চিন্ত যে এ মামলায় তাদের জয় সুনিশ্চিত।

তমাল এবার জমিদার তারিণীশঙ্করকে উদ্দেশ্য করে তার বক্তব্য শুরু করে।

—আপনার নাম ?

—তারিণীশঙ্কর বিশ্বাস।

সংক্ষিপ্ত এবং বিরক্তিজনিত জবাব দেন তারিণীশঙ্কর।

—আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য আমি দুঃখিত মিঃ বিশ্বাস। মাত্র দু-তিনটি প্রশ্ন করব আপনাকে।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে তমাল কয়েক হাত পিছিয়ে এসে গলার

স্বর একটু বাড়িয়ে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা মিঃ বিশ্বাস, আপনি কি সিগারেট খান ?

—না।

—ধূমপান করেন না ?

—করি, তবে চুরুট খাই আমি।

—আচ্ছা আপনার সেরেস্তায় কে সিগ্রেট খায় তা কি আপনি জানেন ?

—না।

—এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, যেদিন আপনি আসামী ভবানীপ্রসাদ সেনকে টাকা দিয়েছিলেন সেদিন বিকেলে বা রাত্রে আপনার কাছে এমন কেউ কি এসেছিলেন যিনি সিগারেট খান ?

—না।

—ধন্যবাদ। আমার তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল আপনার ভাগ্নে সমীর হালদার আপনার বাড়িতে কতদিন যাবৎ বসবাস করছিলেন ?

—সেই ত দিন-দশেক আগে এসেছিল, তারপর আমার মন-মেজাজ খারাপ দেখে এই হত্যাকাণ্ডের চার-পাঁচদিন পরই চলে যায়।

—ও, তিনি কি নিছক বেড়াতে এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ, বেড়াতে এসেছিল বৈকি, তবে একদিন কথায় কথায় বলেছিল কিছু টাকা হলে একটা ব্যবসা করত।

—উনি কত টাকা চেয়েছিলেন ?

—হাজার পঞ্চাশেক।

—আপনি দিয়েছিলেন সে টাকা ?

—না, আমি পরে অর্থাৎ মাস-চারেক পর হলে যদি চলে তাহলে দিতে চেষ্টা করব বলেছিলাম।

—বেশ, মেনি থ্যাঙ্কস্। এবার আপনি যেতে পারেন।

তারিণীশঙ্কর কাঠগড়া থেকে নেমে গেলে তমাল কোর্ট

ইনস্‌পেক্টারকে ডেকে নীচুস্বরে কিছু বলে। কোর্ট ইনস্‌পেক্টার উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য ক'রে বললেন,—এখানে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে শ্রীসমীর হালদার মহাশয়কে একবার আসতে অনুরোধ করছি।

প্রায় দুই মিনিট চুপচাপ কেটে যাবার পর উপবিষ্ট তারিণীশঙ্করের পাশ থেকে একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে একবার তারিণীশঙ্করের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন কাঠগড়ার কাছে।

বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ। সাহেবী বেশভূষা। মার্জিত রুচি ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। দীর্ঘ দেহ। হঠাৎ এভাবে ডাক পড়বার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তাই চোখে-মুখে একটা আশ্চর্য ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে।

কোর্ট ইনস্‌পেক্টার সমীর হালদারকে কাঠগড়ায় দাঁড়াবার নির্দেশ দিতে তিনি কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে আদালতশুদ্ধ সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তাঁর উপর।

—আপনার নাম? ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে তমাল।

—সমীরকুমার হালদার।

—পেশা?

—ব্যবসা।

—আচ্ছা সমীরবাবু, আপনাকে দু-চারটি প্রশ্ন করব। আশা করি ঠিকমত উত্তর দিয়ে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করবেন। তাছাড়া আপনার বক্তব্যের উপর একজন নির্দোষ ভদ্রলোকের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

—বেশ। সংক্ষিপ্ত উত্তর সমীর হালদারের মুখে।

—আপনি সিগারেট খান?

সমীর হালদার একবার মামা তারিণীশঙ্করের চেহারার উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে এনে তমালের দিকে তাকিয়ে বলে,—হ্যাঁ।

—বিশেষ কোন ব্রাণ্ডের উপর আপনার টেস্ট আছে কি ?

—প্লেয়াস্-কেই আমি ফেভার করি।

—থ্যাঙ্কস্। আমি মহামান্য ন্যায়াধীশের অনুমতিক্রমেই আপনার বর্তমান সিগারেটের প্যাকেটটা একটু দেখতে চাই।

—আই অবজেক্ট ইওর অনার! কথার মধ্যে প্রতিবাদ করেন বিশ্বনাথবাবু,—একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে অনর্থক এই মামলার সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে হয়রানি করবার কোন অধিকার নেই। অযথা কেসটাকে জটিল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিচারক হাত তুলে বিশ্বনাথবাবুকে বললেন,—প্লিজ লেট হিম প্রসিড। দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ দি কেস্।

মিঃ বসু অগত্যা নিজের আসনে বসে পড়লেন। তমাল সমীর হালদারের দিকে তাকাতে সমীর হালদার তাঁর পকেট থেকে একটা প্লেয়ারস্-এর প্যাকেট বের ক'রে তমালের দিকে এগিয়ে দেন। তমাল সেটা খুলে কিছু দেখে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পিছন ফিরে সামনের আসন থেকে মিঃ গুহঠাকুরতাকে ডাকে।

এগিয়ে এলেন ফিঙ্গার-প্রিন্ট স্পেশালিস্ট মিঃ গুহঠাকুরতা। কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে তমাল তাঁর সামনে পুলিশ রিপোর্টের ফাইল আর একটি সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয়। মিঃ গুহঠাকুরতা পকেট থেকে ছোট একটা মেশিনের মত যন্ত্র বের ক'রে দুটি প্যাকেট মিলিয়ে দেখলেন।

প্রায় দশ মিনিট নীরব নিস্তব্ধভাবে কেটে যায়।

তারপর তিনি মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। প্যাকেট দুটিকে টেবিলের উপর রেখে বললেন,—ইওর অনার! এই দুটি প্যাকেটের উপর এবং আয়রন চেস্টের উপরকার যে ফিঙ্গার প্রিন্ট রয়েছে তা একই ব্যক্তির।

—থ্যাঙ্কস্ মিঃ গুহঠাকুরতা। বলল তমাল।

মিঃ গুহঠাকুরতা মাথা নত ক'রে অভিবাদন ক'রে নেমে আসেন। তমাল এবার মিঃ সান্যালকে আসতে অনুরোধ করে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন অপরাধবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ মিঃ সান্যাল। হৃষ্টপুষ্ট, খর্বাকৃতি চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখে।

মিঃ সান্যাল তাঁর টাক-মাথাটি ঈষৎ কাৎ ক'রে সাহেবী কায়দায় বিচারপতিকে অভিবাদন জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

—মাননীয় বিচারপতি, জুরি মহোদয়গণ ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী! এই মামলার পুলিশ রিপোর্ট এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ ক'রে অপরাধবিজ্ঞানসম্মতভাবে আমার বক্তব্য হ'ল, অভ্যস্ত ধূমপায়ী বা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের অভ্যাস থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রধান ব্যক্তির মধ্যে সেই বিশেষ অভ্যাসটি খুঁজে পাচ্ছি। আমার আগে ফিঙ্গার-প্রিণ্ট স্পেশালিস্ট ব'লে গেছেন যে জমিদারবাড়ির কাচারী ঘরের আয়রন চেস্ট এবং প্রাপ্ত সিগারেটের প্যাকেটের উপরকার আঙুলের ছাপ একই ব্যক্তির। সেই সঙ্গে সিগারেটের রাংতা ছেঁড়ার পদ্ধতিটাও একই। অর্থাৎ এই প্যাকেটটির মালিক যিনি, সেই ব্যক্তি উক্ত প্যাকেটটিরও মালিক। তাছাড়া অপরাধী যতই চতুর হোন না কেন, ঘটনাস্থলে নিজের অপরাধের কিছু-না-কিছু সূত্র রেখে যেতে বাধ্য। এক্ষেত্রে এই সিগারেটের প্যাকেটটাই তা জানিয়ে দিচ্ছে অপরাধীকে।

মিঃ সান্যাল তার বক্তব্য শেষ ক'রে নেমে আসেন।

তমাল এবার এগিয়ে গিয়ে বিচারককে উদ্দেশ্য ক'রে তার বক্তব্য বলতে শুরু করে,—অনারেবল জাস্টিস্ এণ্ড মেম্বারস্ অব দি জুরি! আপনাদের সামনে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত। সমীর হালদার তাঁর মামাবাড়িতে যে টাকার যোগাড় করতে গিয়েছিলেন সেকথা তারিণীশঙ্করবাবু স্বীকার করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশ রিপোর্টের এতবড় একটা ঘটনাকে আমার বিরোধীপক্ষের

আইনজ্ঞ মহাশয় কোন প্রাধান্যই দেননি। তিনি একতরফা দেখে সোজাসুজি কোন্ আইনের বলে একটি নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন তা আমার জানা নেই।

প্রথমতঃ, আমরা দেখব হত্যাকাণ্ডের সময় ঘটনাস্থলে যারা উপস্থিত ছিল তাদের স্বভাবচরিত্র কেমন। অন্যান্য সকলকে আমরা বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি, দেখিনি শুধু একজনকে। তিনি হলেন মিঃ হালদার। তিনি কিছুদিন যাবৎ আইনবিরুদ্ধ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন; তাতে কিছু টাকা লোকসান যায় এবং বাজারে দেনার দায়ে ভদ্রভাবে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন টাকার জন্য তিনি আসেন মামার কাছে। কয়েকদিন থেকে সুযোগমত মামার কাছে প্রস্তাব করেন। কিন্তু সেখানে তেমন সুবিধা না হওয়াতে অন্য কি উপায়ে টাকার ব্যবস্থা করা যায় সেই কথা ভাবছিলেন। কাচারী ঘরের সিন্দুকে সর্বদা যে টাকা থাকত তাতে কোন কাজ হবার আশা নেই। কিন্তু সেদিন হঠাৎ ভবানীপ্রসাদের হাতে একসঙ্গে অত টাকা দেখে তাকে লক্ষ্য করতে থাকেন এবং মনে মনে প্ল্যান করতে থাকেন যে-কোন উপায়ে হোক ঐ টাকা তাঁকে নিতেই হবে। তারপর নানা ছলছুতো ক'রে ভবানীপ্রসাদের বাড়ি চলে যাওয়া অবধি তাকে লক্ষ্য করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইদিনই ভাবানীপ্রসাদ চাবি ফেলে যান। অপরাধী জানত, চাবি হরিহরবাবুর কাছে রয়েছে। তাই সে স্বভাব-অপরাধীর মত তার কাজ শেষ ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।

তারপর ভবানীপ্রসাদ তার নিজের বক্তব্যে স্বীকার করেছেন যে, চাবি তিনি ভুলে ফেলে গিয়েছিলেন। একথা যে-কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বিশ্বাস করবেন না যে-কোন অপরাধী হত্যা ক'রে টাকা অপহরণ ক'রে তারই চাবি সিন্দুকের ডালায় লাগিয়ে রেখে যাবে।

তাছাড়া পরদিন সকালে ঘটনাস্থলে এসে পৌছানো পর্যন্ত

তিনি জানতেন না যে, তাঁরই চাবি দিয়ে সিন্দুক খোলা হয়েছে। ঘটনাস্থলে আসতেই যখন সকলে তাঁকেই খুনী সাব্যস্ত ক'রে তাড়া ক'রে আসে, অথন অনন্যোপায় হয়ে তিনি ছুটে যান উপরে তাঁর মনিবের কাছে তাঁর নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে এবং ভুলের কথা অকপটে জানিয়ে মিথ্যে কলঙ্কের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মনিবের সাহায্য প্রার্থনা করতে, যেখানে তাঁর তিরিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ বিশ্বাস জমা রয়েছে। কিন্তু সেখানে যেতেই তাঁর কোন কথা না শুনেই একেবারে মামা-ভাগ্নে তাড়া ক'রে আসেন পুলিশে দিয়ে তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবেন ব'লে।

মিঃ লর্ডের কাছে আমার বক্তব্য হ'ল—মনঃস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, কোন মানুষ তাঁর নিজের চরিত্রের প্রধান দোষ-ত্রুটি অপরের মধ্যে চাপিয়ে দেবার সুযোগ পেলে সে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি সমীর হালদারের ক্ষেত্রে।

এর পর আমরা দেখব মোটিভ। এই হত্যার উদ্দেশ্য কি ?

উদ্দেশ্য অর্থাপহরণ, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেই সময়ে অভিযুক্ত ভবানীপ্রসাদের অর্ধ লক্ষ টাকার এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যে, সারা জীবনের বিশ্বাস ভালবাসা সুনাম নষ্ট করে, হত্যার পরিণাম জেনেও ঐ পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে হত্যা ক'রে টাকা হস্তগত করতে হবে।

নেক্সট্। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি একমাত্র স্বভাবজাত পাকা খুনী না হলে খুন হবার চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাস্থলে আসা অসম্ভব। এখানে অভিযুক্ত ভবানীপ্রসাদের সমস্ত জীবনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে ক্রিমিন্যাল মেণ্টালিটি ত দূরের কথা, তাঁর ঐ সুদীর্ঘ চাকরি-জীবনে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতিরও আভাষ পাওয়া যায় না, একথা তারিণীশঙ্করবাবু তাঁর নিজের বক্তব্যে স্বীকার করেছেন।

নেক্সট্। শুধু টাকাই যদি তাঁর প্রয়োজন হত তাহলে বৃদ্ধ

হরিবাবুকে হত্যা ক'রে টাকাটা নেবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ঐ টাকাটা নিয়ে তিনি যেখানে যাচ্ছিলেন সেই বিপদসঙ্কুল রাস্তায় যে কোন মুহূর্তে চুরি ডাকাতি রাহাজানি হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতএব তিনি যদি টাকাটা অন্য কোথাও সরিয়ে রেখে তারিণীশঙ্করবাবুর সামনে এসে সামান্য একটু অভিনয় করতেন তাহলে তারিণীশঙ্করবাবু আরো সহজে বিশ্বাস করতেন এবং আমার মনে হয় তার জন্য ভবানীপ্রসাদের নামে কেস ক'রে বা অন্য কোন উপায়ে টাকাটা আদায় করা বা তাকে শাস্তি দিয়ে পর্যুদস্ত করতেন না। তেমন সন্দেহের কোন কারণ থাকলে এই দীর্ঘদিন ঐ বাঘা মনিবের কাছে চাকরি করতে পারতেন না।

মানুষের জীবনে ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কত প্রকার ভুলই না করছি। কিন্তু ভবানী-প্রসাদ তাঁর জীবনে একটিবারই চাবি ভুল ক'রে ফেলে গেছেন এবং সেইদিনই ঘটে যায় এই ভীষণ দুর্ঘটনা। এখন আমরা ধরে নিতে পারি ঐদিন আসামী যদি চাবি ভুল ক'রে ফেলে না যেতেন তাহলেও চোর অন্য কোন উপায়ে টাকাটা হস্তগত করত।

আসামী ভবানীপ্রসাদের তরফ থেকে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, তাঁর এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি নিশ্চয় ছিল যে, চাবি খুলে সিন্দুক থেকে টাকা নিতে পারে তারা যাদের কাছে চাবি আছে। এ ক্ষেত্রে চাবি থাকে মাত্র দু'জনের কাছে। যদি ধরে নেওয়া যায় ভবানীপ্রসাদই সিন্দুক খুলেছিলেন, তাহলে একথা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, তিনি তাঁর চাবিটা সিন্দুকের ডালায় লাগিয়ে রেখে চলে যাবেন।

আর যদি গোড়া থেকেই খুন করবার মনোবৃত্তি থাকত তাঁর তাহলে নিশ্চয় একটা মানুষকে খুন ক'রে পঞ্চাশ হাজার টাকা আত্মস্যাৎ ক'রে সকালে ঘটনাস্থলে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যার রক্তের মধ্যে খুনীবৃত্তি পুরোপুরি রয়েছে তেমন পেশাদার খুনীও সাহস করতে পারে না।

মাই নেক্সট পয়েণ্ট ইজ ছাট, ভবানীপ্রসাদ যখন তাঁর মনিব তারিণীশঙ্করবাবুর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গেলেন তখন সবচেয়ে আগে তাড়া ক'রে এলেন সমীর হালদার। তারপর তারিণীশঙ্কর ভাগ্নের সুরে সুর মেলালেন।

এ অবস্থায় একজন নিরপরাধ ভদ্রসন্তানের পক্ষে নিজেকে বাঁচাবার মাত্র দুটি পথই খোলা থাকে। একটি কোন প্রকারে আত্মহত্যা করা, আর অন্যটি পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করা।

অভিযুক্ত ভবানীপ্রসাদের পক্ষে এক্ষেত্রে প্রথমটি অর্থাৎ আত্মহত্যা করা সহজ নয় ব'লে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন পালিয়ে যেতে।

মহামান্য বিচারপতিকে এবং জুরি মহোদয়গণকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি—ভবানীপ্রসাদ যখন সাত বৎসর পালিয়ে থাকতে পেরেছিলেন, আরও দু-পাঁচ বৎসর থাকা বোধ হয় তাঁর পক্ষে অসুবিধা ছিল না। এই দীর্ঘ সাত বৎসর যাবৎ সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে তিনি অর্থ উপার্জন করেছেন মামলার খরচ চালাবার জন্য। তারপর তিনি নিজের ইচ্ছায় নিজেকে আইনের হাতে সমর্পণ করেছেন তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য।

অতএব মহামান্য ন্যায়াধীশের কাছে আমার প্রার্থনা, একজন নিরপরাধ নিরুপায় লোককে মিথ্যা কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে এবং প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে ন্যায়ালয়ের ও মানবতার মর্যাদা রক্ষা করুন।....য়্যাণ্ড হিয়ার ইজ দি এণ্ড অফ মাই প্রেয়ার।

উপস্থিত সকলের চোখে-মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে।

বিচারপতি সমীর হালদারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন,—শ্রীসমীর হালদার মহাশয়ের এ-বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

সমীর হালদার তেমনি মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। কোন ভাষা নেই তাঁর মুখে।

এবার বিচারপতি জুরিদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—এই কেসের সকল ঘটনা আপনারা আনুপূর্বিক শুনেছেন। আসামী

ভবানীপ্রসাদ সেন-এর সম্বন্ধে আপনাদের মতবাদ ব্যক্ত করতে অনুরোধ করছি।

অতঃপর জুরিগণ সকলে উঠে পাশের খাস-কামরায় চলে যান এবং প্রায় পনেরো মিনিট পর ফিরে এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। একজন উঠে এসে একখানি কাগজ বিচারকের সামনে এগিয়ে দেন। বিচারক কাগজখানি দেখে রায় লিখে এগিয়ে দিলেন পেস্কারের হাতে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সেই লিখিত রায় পড়ে শোনাতে লাগলেন, উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাভাবে অভিযুক্ত ভবানীপ্রসাদ সেনকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হইল এবং শ্রীসমীর হালদারকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হইল।

সমস্ত আদালত কক্ষ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

তমাল এগিয়ে যায় আসামী কাঠগড়ার সামনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানীপ্রসাদ বেরিয়ে আসেন বাইরে। এসেই সামনে তমালকে দেখে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন।

দুজনের চোখেই আনন্দের অশ্রুবিন্দু টলটল করতে থাকে।

ইতিমধ্যে সুবীর এসে হাজির হয়েছে। ভবানীপ্রসাদ সুবীর আর তমালের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন,—চলো বাবা, বাইরে চলো।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের 'বাবা' ডাক শুনে ভবানীপ্রসাদ থমকে দাঁড়ান। চাঁপা আর নন্দর মাকে বসতে ব'লে মিতা উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত শরীর ওর থর-থর ক'রে কাঁপছে। সামনের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে মাথাটা যেন কেমন ক'রে ওঠে, চোখের সামনে যেন একটা কালো কুণ্ডলী ঘুরতে-ঘুরতে এসে চোখটাকে চাপা দেয়। দুটো হাত সামনের দিকে কাৎ হয়ে পড়ে যায়। নন্দর মা মুহূর্তের মধ্যে ওকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে।

—দাদাবাবু, শিগ্‌গির আসুন, দেখুন কি সর্বনাশ হয়ে গেল!

তমালের বুকের মধ্যে হাহাকার ক'রে ওঠে, মিতার এ কি হল?

কিন্তু পা তবুও এগুতে চায় না। অগত্যা এগিয়ে আসে তমাল এবং কোন-কিছু না বুঝেই পিছনে পিছনে আসেন ভবানীপ্রসাদ। তাঁর পিছনে সুবীর।

—নন্দর মা, শিগ্‌গির যাও ঐ পাশের ছোট ঘরটায় ঢুকেই ডান দিকে টুলের উপর জলের কুঁজো আছে, নিয়ে এসো।

নন্দর মা ছুটে যায় এবং মুহূর্তে জলের কুঁজো নিয়ে আসতে তমাল জলের ঝাপটা দিতে থাকে মিতার চোখে-মুখে। নির্বাক চাঁপা তাকিয়ে থাকে তমালের মুখের দিকে। পাশে বসে মিতার মাথাটা কোলে তুলে নেয়।

তমাল চিনতে পারে এই সেই চাঁপা। মিতার মায়ের অনুগত এবং তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ হেম লজের গৃহকর্ত্রী। কিন্তু আজ একটিও কথা নেই তার মুখে।

মিনিট দশেক কেটে যায় এমনি ক'রে। ধীরে-ধীরে মিতা চোখ খোলে। চোখের সামনে তমালকে দেখে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না। শুধু বুকের ওঠা-নামা বেড়ে যায়। তমাল সুবীরকে বলে,—সুধীর, ওকে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর ভাই।

সুবীর তমালের কথায় দাঁতে দাঁত চেপে বলে,—আমি কারো ভাই-টাই নই। তোমার কাজ থাকলে তুমি যেতে পারো। আমার কর্তব্য আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না।

সুবীর ও তমাল মিতাকে ধরে নীচের গাড়িতে নিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথবাবু এবং বার লাইব্রেরী থেকে অনেকেই এসে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছেন। সকলেই অবাক হয়ে যান এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়।

তমাল ড্রাইভিং সীটে বসে স্টার্ট ক'রে। পিছনের সীটে চাঁপা আর নন্দর মা মিতাকে নিয়ে বসেছে। পিছনে সুবীরের গাড়িতে ভবানীপ্রসাদ, বিশ্বনাথবাবু, মিঃ গাঙ্গুলী এবং আরো চার-পাঁচখানা গাড়িতে কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি এলেন বাড়ি অবধি।

হেম লজে পৌঁছেই সুবীর হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠায়। ডাঃ ভট্টাচার্য আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পৌঁছান।

খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সুবীরের মা এসে পৌঁছলেন হেম লজে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—এ ফুলের মত জীবনটা তমালই শেষ করল।

ডাক্তার তাঁর তৃতীয় ইনজেকস্‌ন শেষ করলেন।

সুবীর এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—ডাঃ ভট্টাচার্য, কেমন বুঝছেন?

ডাঃ ভট্টাচার্য সিরিঞ্জটা টেবিলের উপর রেখে বললেন,—এখনই জোর ক'রে কিছু বলা শক্ত। ব্রেনে খুব জোন শক্ পেয়েছেন। তবে এর কারণটা যদি জানতে পারতাম তাহলে আমাদের চিকিৎসা করতে একটু সুবিধা হত।

—ডক্টর! আশ্চর্যভাবে ব'লে ওঠে সুবীর। ওর ব্রেন······

—হ্যাঁ মিঃ চৌধুরী!

হতবাক সুবীর মুহূর্তকাল চিন্তা ক'রে বলে—আপনি আসুন আমার সঙ্গে, আমি সব বলছি।

সকলে পাশের ঘরে এসে বসতে সুবীর আনুপূর্বিক সব কথা খুলে বলে।

ডাঃ ভট্টাচার্য উঠে এলেন মিতার ঘরে।

এতক্ষণ তমাল একা মিতার পাশে বসেছিল। শিয়রের কাছে চাঁপা মাথা নীচু ক'রে বসে আছে।

—মিঃ সেন! ডাঃ ভট্টাচার্য ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, ডাক্তার হিসেবেই বলুন আর মানবতার খাতিরেই বলুন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এখনও উনি যদি জানতে পারেন যে, আপনি ওকে ক্ষমা করেছেন তাহলে হয়ত একটু চেঞ্জ হতে পারে।

তমাল অপরাধীর মত মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

—আমাকে কথা দিন মিঃ সেন। সুবীরবাবুর কাছে যা শুনলাম,

যদিও এটা সম্পূর্ণ আমার আলোচনার অধিকারের বাইরে—তবুও একজন চিকিৎসকের কর্তব্য হিসেবে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, অন্ততঃ চব্বিশটা ঘণ্টা ওকে বিশ্বাস করতে দিন যে, আপনি ওকে ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। আমাদের একটু চেষ্টা করতে দিন। প্লিজ, মিঃ সেন, প্লিজ……

তমাল এতক্ষণ মিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। ডাঃ ভট্টাচার্যের কথায় ওর সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। ভাবে, মিতার যদি তেমন কিছু হয়ে যায় তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু এতদিন ও যে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব ক'রে এসেছে সে কথা ত একমাত্র ও নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। অপবকে কেমন ক'রে সে বোঝাবে যে তার হৃদয়সাগরেও চলেছে প্রলয় ঝড়। তমালের চোখের সামনে সবকিছু যেন ঝাপ্সা হয়ে আসে। টপ-টপ ক'রে দু-ফোঁটা অনুতাপের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে। তেমনি মাথা নীচু ক'রেই তমাল বলে,—আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো, ডক্টর। আর আমি কোথাও যাবো না।

—থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ সেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমি পাশের ঘরে আছি। আমরা ততক্ষণে কন্সাল্ট করছি। ইতিমধ্যে সেন্স ফিরলেই এই ওষুধটা ড্রপারে ক'রে পাঁচ ফোঁটা ওকে খাইয়ে দেবেন এবং আমাকে একবার ডাকবেন। ওর সামনে বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করবেন না। ব্যাপারটা খুব লাইট ক'রে নেবেন, কেমন?

তমাল মাথা কাৎ করে সম্মতি জানায়।

ডাঃ ভট্টাচার্য পাশের ঘরে গিয়ে বসেন।

ভবানীপ্রসাদ আর সুবীরের মা-বাবা ঘরে এসে ঢোকেন।

—বৌমার জীবন-মরণ তোমার উপর নির্ভর করছে খোকা। ওকে সারিয়ে তুলতেই হবে। তুমি এখানেই থাকবে যতক্ষণ ওর জ্ঞান ফিরে না আসে।

সুবীরের মা মিতার মাথায় হাত দিয়ে উত্তাপটা দেখে দিয়ে ফিরে আসেন দরজার কাছে।

—আমরা যাচ্ছি খোকা, সুবীরও রইল এখানে। যা ভাল বোঝ কর।

সুবীরের মা সকলকে ডেকে বাইরে আসেন। সিঁড়ির কাছে চাঁপার সঙ্গে দেখা হতে চাঁপা বলল,—যদি অসুবিধা না হয় তাহলে আজ এখানেই আপনারা থাকুন, কোন অসুবিধা হবে না। আমি যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।

সকলে নেমে যায় নীচের ঘরে।

রাত তখন ছুটো।

তমাল এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে মিতার চোখের দিকে। এ মিতা যেন সেই মিতার কঙ্কাল। একেবারে শেষ ক'রে ফেলেছে নিজেকে তিলে-তিলে দগ্ধ ক'রে। একদিন এই বাদামী চোখের তারায় ফুলঝুরি ছুটতো, বহু পৌরুষত্বের তেজ হয়ে যেতো ম্লান, আজ সেই চোখের কোণে বিষাদঘন কালির রেখা।

সেই স্বর্গীয় সুষমাময় মুখখানার চারিদিকে জেগে উঠেছে অনিয়ম কৃচ্ছসাধনের অকাল-বলিরেখা। সেই পদ্মপাপড়ির মত অনিন্দ্যসুন্দর লাল টুকটুকে ঠোঁট ছুটি যেন চুপসে গেছে। কণ্ঠের নীচে ভেসে উঠেছে হাড়। সমস্ত শরীরটাতে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে।

তমাল ভাবে, তাহলে সে কি ভুল করলো ?

তমালের পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে মিতার চোখের বন্ধকরা পাতা ছুটির উপর। ধীরে-ধীরে মিতার চোখছুটো যেন একটু একটু কাঁপছে। হ্যাঁ, এবার বোধ হয় ওর জ্ঞান ফিরবে। বুকের ওঠা-নামাও বেড়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশী। হাঁপাচ্ছে।. তারপর ধীরে ধীরে চোখ খোলে মিতা। তমাল কপালে হাত দিয়ে দেখে উত্তাপটা অনেক কমে গেছে। চোখ খুলতেই তমালের চোখে চোখ পড়তে

মিতা একটা হাত তুলে তমালের কাঁধের উপর রাখে। তমালের মাথাটা নেমে আসে মিতার মুখের উপর। এ স্পর্শ যেন চাঁদ-ঝরা শিশিরের কণা।

—তুমি!

—হ্যাঁ মিতা, আমি তমাল।

—তুমি কি চলে যাবে?......আর কথা বলতে পারে না মিতা। ওর পাতলা ঠোঁট দুটো থর-থর ক'রে কেঁপে ওঠে, চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বন্যার মত অশ্রু।

—না মিতা, আমি তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না। কথা দিচ্ছি, আমি তোমারই—আমি তোমারই—চিরদিনের, চিরকালের।

ডাঃ ভট্টাচার্যকে খবর দিতে তিনি এসে মিতার মুখের হাসি-হাসি ভাবটা দেখে তমালের পিঠ চপড়ে বলেন—কন্‌গ্র্যাচুলেশন, মিঃ সেন। এবার তাহলে আমি চলি। ওর আর ইন্‌জেক্‌সনের দরকার নেই। ঐ ট্যাবলেটটা চার ঘণ্টা পর-পর খাওয়াবেন। আমি আবার সকালে আসব। ইতিমধ্যে দরকার মনে করলে আমাকে সংবাদ দেবেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর! গুড নাইট!

ডাঃ ভট্টাচার্য বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

খোলা জানালা পথে রাত্রি শেষের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে হু-হু ক'রে। মিতার অবিন্যস্ত চুলগুলি এলেমেলো হয়ে আছড়ে পড়ে কপালের উপর। তমাল সরিয়ে দেয় অবাধ্য চুলগুলিকে।

তারপর?

তারপর দুটি বিরহ-কাতর মিলন-পিয়াসী হৃদয় মিশে এক হয়ে যায়। বর্ণ, গন্ধ, শব্দ ও অনুভূতিভূর্ণ এক ক্লান্ত প্রহর যেন নিস্তব্ধ নিরুদ্বেগ কোন্ মহাসাগরে গিয়ে মিশে যায়।

—•:(*):•—